সূর্যের দিন

হুমায়ূন আহমেদ

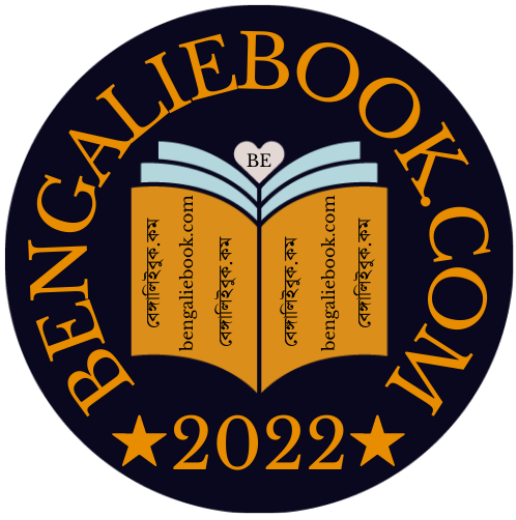

সূচিপত্র

১. এ বাড়ির নিয়ম..... 3
২. ভয়াল-ছয় বাহিনী..... 11
৩. ছুটির দিনে খোকন..... 19
৪. ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্য..... 31
৫. খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব..... 41
৬. সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে..... 47
৭. কার্ফু তোলা হলো..... 59
৮. কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই..... 64
৯. চায়ের জমকালো আয়োজন..... 67
১০. সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান..... 71
১১. মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে..... 77
১২. সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে..... 85
১৩. পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকে..... 91

১৪. নীলু খুব মন খারাপ করে..... 98

১৫. খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ.....103

১৬. সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছল.....111

১. এ বাড়ির নিয়ম

এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে যাদের বয়স চৌদ্দর নিচে, তাদের বিকেল পাঁচটার আগে ঘরে ফিরতে হবে। যাদের বয়স আঠারোর নিচে, তাদের ফিরতে হবে ছটার মধ্যে।

খোকনের বয়স তেরো বছর তিন মাস। কাজেই তার বাইরে থাকার মেয়াদ পাঁচটা। কিন্তু এখন বাজছে সাড়ে সাতটা। বাড়ির কাছাকাছি এসে খোকনের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণা পেয়ে গেল। আজ বড়চাচার সামনে পড়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে।

অবশ্যি চমৎকার একটি গল্প তৈরি করা আছে। খোকন ভেবে রেখেছে সে মুখ কালো করে বলবে, সাজ্জাদের সঙ্গে স্কুলে খেলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিরাট একটা মিছিল আসছে। সবাই খুব স্লোগান দিচ্ছে, জাগো বাঙালি জাগো। আমরা দূর থেকে দেখছি। এমন সময় গণ্ডগোল লেগে গেল। পুলিশের গাড়ির ওপর সবাই ইটপাটকেল মারতে লাগল। চারদিকে হইচই, ছোটাছুটি। আমি সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। পেছনে চারদিকে পটাপট শব্দ হচ্ছে, বোধহয় গুলি হচ্ছে। আমরা আর পেছন ফিরে তাকাইনি, ছুটছি তো ছুটছিই। ফিরতে দেরি হলো এইজন্যে।

খুবই বিশ্বাসযোগ্য গল্প। আজকাল রোজই মিছিল হচ্ছে। আর রোজই গণ্ডগোল হচ্ছে। মিছিলের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বড়চাচাকে ঠিক সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তার সম্ভবত তিন নম্বর চোখ বলে কিছু আছে যা দিয়ে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত দেখে ফেলেন। কথা বলতে শুরু করেন অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। ভাবখানা এরকম যেন কিছুই জানেন না।

সেবারের ঘটনাটাই ধরা যাক। ফজলুর পাল্লায় পড়ে ফার্স্ট শো সিনেমা (গোলিয়াথ অ্যান্ড দ্য ড্রাগন, খুবই মারাত্মক ছবি দেখে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র বড়চাচার সামনে পড়ে গেল। বড়চাচা হাসিমুখে বললেন, এই যে খোকন, এইমাত্র ফিরলে বুঝি?

জি চাচা।

একটু মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

অঙ্ক করছিলাম।

তাই নাকি?

জি। ফজলুর এক মামা এসেছেন। খুব ভালো অঙ্ক জানেন। উনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

পাটিগণিত?

জি পাটিগণিত। পাটিগণিতই উনি ভালো জানেন। তৈলাক্ত বাশের অঙ্কটা আজ খুব ভালো বুঝেছি।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, একটা মুশকিল হয়ে গেল খোকন। তোমার দেরি দেখে ফজলুদের বাসায় লোক পাঠানো হয়েছিল। সে কিন্তু তোমাদের দেখতে পায়নি।

খোকন মহা বিপদেও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। এবারও পারল। হাসিমুখে বলল, আমরা তো ফজলুর বাসায় অল্প করছিলাম না। ওদের বাসায় খুব গণ্ডগোল হয় তো, তাই আমরা জহিরদের বাসায় গেলাম।

এটা ভালোই করেছ। পড়াশোনা করার জন্যে নিরিবিলি দরকার। ফজলুর মামা যে তোমাদের জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সেজন্যে তুমি তাকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিয়ো।

জি চাচা, দেব।

আর তুমি তাকে আগামীকাল আমাদের বাসায় চা খেতে বলবে। তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবে, কেমন?

খোকন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বড়চাচা চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, খোকন, কী সিনেমা দেখলে।

এই হচ্ছেন বড়চাচা। এরকম একজন মানুষের ভয়ে যদি কারও বুক কাঁপে তাহলে বোধহয় তাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলা ঠিক হবে না। খোকন এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘামতে লাগল।

তবে একতলার সবচেয়ে বাঁ-দিকের ঘরটিতে আলো জ্বলছে। এটা একটা সুলক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বড়চাচার কাছে মক্কেল এসেছে। তিনি মামলার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। খোকন এত রাত পর্যন্ত বাইরে এটা বোধহয় এখনো ধরতে পারেননি। যা হওয়ার হবে। খোকন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হলো না। সবাই যেন কেমন খুশি খুশি। উৎসব উৎসব একটা ভাব। ছোটরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কেউ তাদের বকছে না। বড়চাচি পান বানাতে বানাতে কী একটা গল্প বলে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। ঈদের আগের রাতে যেরকম একটা আনন্দভাব থাকে, চারদিকের অবস্থা সেরকম। কিছু ঘটেছে, কিন্তু এখনই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। খোকন এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন সে সারাক্ষণ বাড়িতেই ছিল। অনজু আর বিলু সাপলুডু খেলছিল। ওদের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বিলুটা মহা চোর। তার পড়েছে চার কিন্তু সে পাঁচ চেলে তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেল। পরেরবার উঠল পাঁচ, একেবারে সাপের মুখে। সে আবার চালল চার। অনজুটা এমন বোকা কিছুই বুঝতে পারছে না। খোকন বলল, এসব কী হচ্ছে বিলু?

কিছুই হচ্ছে না। তুমি মেয়েদের খেলায় কথা বলতে এসেছ কেন? কোথায় ছিলে সারা সন্ধ্যা?

ঘরেই ছিলাম। যাব আবার কোথায়?

খোকন সেখানে আর দাঁড়াল না। চলে এল দোতলায়। বাবার ঘরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, প্যাথলজি শব্দের মানে কী? যাতে বাবা বুঝতে পারেন সে পড়াশোনা নিয়েই আছে।

বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করা মুশকিল। তিনি অল্পকথায় কোনো জবাব দিতে পারেন। প্যাথলজি শব্দের মানে বলতে তিনি পনেরো মিনিট সময় নিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা বললেন, ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস বললেন, শারীরবিদ্যায় প্রাচীন গ্রিকদের অবদানের কথা

বললেন। খোকন চোখ বড় বড় করে শুনল। তার ভঙ্গিটা এরকম যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। বাবা বক্তৃতা শেষ করে বললেন, যা যা বললাম সব খাতায় লিখে রাখবে।

জি রাখব।

লিখবার আগে ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়াটাও দেখে নেবে। আমি হয়তো অনেক পয়েন্ট মিস করেছি।

আমি দেখে তারপর লিখব।

গুড। আর শোনো, সন্ধ্যাবেলা তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। সারা বিকাল তুমি তার কাছে যাওনি। চারদিকে ঝামেলা টামেলা হচ্ছে, সে খুব চিন্তিত থাকে। যাও, দেখা করে আসো।

.

মা থাকেন দোতলায় সবচেয়ে শেষ ঘরটায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। হার্টের খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ, যাতে একটুও নড়াচাড়া করা যায় না। রাতেরবেলা একজন অ্যাংলো নার্স মিস গ্রিফিন এসে মার সঙ্গে থাকে। সে ছেলেদের মতো সিগারেট খায়। বাচ্চারা কেউ শব্দ করে সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

মিস গ্রিফিন মার ঘরের সামনের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল। খোকনকে দেখেই ভ্রু কুঁচকে বলল, কী চাও তুমি?

মার কাছে যাব।

এখন না। এখন ঘুমাচ্ছে। সকালে আসবে। গো অ্যাওয়ে।

খোকন নিচে নেমে এসে দেখল টেবিলে ভাত দেওয়া হয়েছে। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসবে। ফার্স্ট ব্যাচ হচ্ছে বাচ্চাদের, যাদের বয়স পনেরোর নিচে, তাদের। এদের সঙ্গে বসে খেতে খোকনের লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই, বড়চাচার নিয়ম। কবির ভাই গত নভেম্বরে পনেরোতে পড়েছেন। কাজেই তিনি এখন গম্ভীর মুখে সেকেন্ড ব্যাচ বড়দের সঙ্গে খেতে বসেন। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসলেই এক ফাঁকে এসে বলেন, আহ বড় গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়ার সময় এত কথা কিসের? খোকনের গা জ্বলে যায়। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কী?

খেতে বসেই খোকন জানতে পারল কী জন্যে আজ বাড়িতে এমন খুশি খুশি ভাব। ছোটচাচারা আমেরিকা থেকে ঢাকা চলে আসছেন। বিদেশ আর ভালো লাগছে না। আনন্দে খোকন বিষম খেয়ে ফেলল। ছোটচাচা এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকবেন, এরচেয়ে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে নাকি?

ছোটচাচা ফুর্তি ছাড়া এক মিনিটও থাকতে পারেন না। সবসময় তার মাথায় মজার মজার সব ফন্দি আসে। খোকন যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে তখন তিনি একবার ঠিক করলেন, ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের গড় আয় কী তা নিয়ে একটা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষার বিষয় হচ্ছে একজন ভিক্ষুক দৈনিক কত আয় করে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে ময়লা একটা লুঙ্গি পরে খালিগায়ে ভিক্ষা করতে বেরুলেন। দুপুর তিনটার মধ্যে আড়াই সের চাল, এক টাকা পয়ত্রিশ পয়সা এবং একটা ছেড়া হলুদ রঙের সোয়েটার

পেয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি খুব খারাপ না। যে লোক এমন একটা কাণ্ড করে তাকে ভালো না বেসে পারা যায়?

খোকন খাওয়া শেষ করে যখন হাতমুখ ধুচ্ছে তখন বড়চাচা বেরুলেন তার ঘর থেকে। খোকনের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বললেন, সাতটা বাজার দশ মিনিট আগে আমি তোমাকে এ বাড়িতে দেখিনি, কোথায় ছিলে? খোকন বলতে চেষ্টা করল, বাথরুমে ছিলাম। বলতে পারল না। কথা গলা পর্যন্ত এসে আলজিবে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, চারদিকে হাঙ্গামা-হুজ্জত হচ্ছে। এর মধ্যে তুমি বাইরে। স্বাধীনতা বেশি পেয়ে যাচ্ছ। যাই হোক, তুমি কোথায় ছিলে কী করছিলে তা শুদ্ধ বাংলায় লিখে আজ রাত দশটার মধ্যে আমার কাছে জমা দেবে।

জি আচ্ছা।

কাল সারা দিন ঘর থেকে বেরুবে না। সারা দিন থাকবে দোতলায়। নিচে নামবে না।

জি আচ্ছা।

মিছিল-টিছিলে গিয়েছিলে নাকি?

জি-না।

আচ্ছা ঠিক আছে, যাও।

খোকন দোতলায় তার নিজের ঘরে এসে মুখ কালো করে বসে রইল। কী জন্যে আজ ফিরতে দেরি হয়েছে তা লেখাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু বড়চাচার কাছে গোপন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নির্ঘাৎ ধরে ফেলবেন।

খোকন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সত্যি কথাই লিখতে শুরু করল। লেখা হলো সাধু ভাষায়। আজ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) আমরা একটি গোপন দল করিয়াছি। দলটির নাম ভয়াল-ছয়। দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। সদস্যরা কিছুদিনের মধ্যেই পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইবে। আমাদের প্রথম গন্তব্য আফ্রিকার গহীন অরণ্য। কঙ্গো নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

২. ভয়াল-ছয় বাহিনী

প্রায় দশটা বাজে।

ভয়াল-ছয় বাহিনীর দুজন সদস্যকে দেখা গেল খোকনদের বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। দুজন বেশ চিন্তিত। একজনের নাম শাহজাহান। সে বেশ বেঁটে। তার বন্ধুদের ধারণা, যতই দিন যাচ্ছে ততই সে বেঁটে হচ্ছে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় সে নাকি এতটা বেঁটে ছিল না। ক্লাসের ছেলেরা তাকে শাহজাহান ডাকে না, ডাকে বল্টু। বেটে ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সাধারণত খুব লম্বা হয়। কিন্তু শাহজাহানের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাজ্জাদও সাইজে শাহজাহানের মতোই। সাজ্জাদ পড়াশোনা ও মারামারি দুটোতেই সমান দক্ষ বলে তার অন্য কোনো নাম নেই। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় টুনু তাকে দুয়েকবার মুরগি ডাকার চেষ্টা করেছে। সাজ্জাদ টিফিন টাইমে টুনুর নাকে গদাম করে একটা ঘুসি মেরে বলেছিল, আর মুরগি ডাকবি? টুন দুহাতে নাক চেপে বলল, না।

বল, কোনোদিন ডাকব না।

কোনোদিন ডাকব না।

টুনু মুরগি নাম দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেনি। উল্টো তাকেই সবাই চীনা-মুরগি ডাকতে শুরু করল। চীনা-মুরগিও ভয়াল-ছয় বাহিনীর একজন সদস্য। তারও খোকনদের বাসায় আসার কথা ছিল। আসতে পারেনি, কারণ তার ছোটভাই আজ সকালেই সাইকেলের নিচে পড়ে হাত ছিলে ফেলেছে। টুনুকে তার ভাইয়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সাড়ে নটার

মধ্যে টুনুর চলে আসার কথা। কিন্তু আসছে না। এদিকে খোকনও বেরুচ্ছে না বাড়ি থেকে। সাজ্জাদ বলল, কী করবি পন্টু? গেট দিয়ে ঢুকবি খোকনদের বাড়ি।

নাহ।

নাহ কেন? খেয়ে তো ফেলবে না। দারোয়ানকে গিয়ে বলব, আমরা খোকনের বন্ধু।

তুই গিয়ে বল।

সাজ্জাদ সাহস করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও ফিরে এল। খোকনদের বাড়ির দারোয়ানটির চাউনি খুব আন্তরিক মনে হলো না তার কাছে। তার উপর একটি কুকুর আছে। গেটের কাছে যাওয়া মাত্রই সে এমন একটি ডাক ছাড়ল যাকে কুকুরের ডাক বলে মনে হয় না। বল্টু বলল, কিরে ভীতুর ডিম, গেলি না ভিতরে?

বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না।

বল্টু কিছু বলল না। কারণ এটি তারও মনের কথা। যে-বাড়ির ছেলেদের পাঁচ জোড়া জুতা থাকে সে-বাড়িতে ঢুকতে ভালো লাগে না। সাজ্জাদ বলল, ঢিল মারলে কেমন হয়? খোকনের ঘরের জানালায় চল ঢিল মারি।

কোনটা ওর জানালা।

সাজ্জাদ চুপ করে গেল। খোকনের ঘর কোনটি তা তার জানা নেই। একদিন মাত্র সে এসেছিল এ বাড়িতে। তাও ভেতরে ঢোকেনি। বল্টু বলল, চল দারোয়ানকে গিয়ে বলি ভিতরে খবর দিতে। খোকনকে গিয়ে বলবে, দুজন বন্ধু এসেছে খুব জরুরি দরকার।

যদি না যায়?

যাবে না মানে? একশবার যাবে।

তাহলে তুই গিয়ে বল।

আমি একা বলব কেন? আমার কী দায় পড়ল।

দুজনের কাউকেই যেতে হলো না। দেখা গেল দারোয়ান নিজেই আসছে। গেটের ভেতরে তাকে যেরকম ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না।

আপনাদের ডাকে।

কে ডাকে?

বড়সাহেব। আসেন আমার সাথে।

বল্টু এবং সাজ্জাদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বড় সাহেব মানে খোকনের বড়চাচা। তিনি তাদের ডাকবেন কেন শুধু শুধু! এই সময় টুনুকে আসতে দেখা গেল। সে বোধহয় কিছু একটা আঁচ করেছে। সাজ্জাদ দেখল–টুনু দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তেই টুনুকে লম্বা

লম্বা পা ফেলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তে দেখা গেল। এরকম ভীতুর ডিমকে ভয়াল-ছয়-এ ঢোকানো খুব ভুল হয়েছে।

.

বড়চাচা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন।

খোকনের সঙ্গে মনে হয় তোমাদের খুব জরুরি প্রয়োজন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি ঘুরঘুর করছ।

ওরা জবাব দিল না। বড়চাচা বললেন, তোমরা দুজনেই কি ভয়াল-ছয়-এ আছ?

সাজ্জাদ ও বল্টু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এর মানে কী? ভয়াল-ছয়ের কথা তো তার জানার কথা নয়।

বড়চাচা শান্তস্বরে বললেন, তোমরা কি বোকনের বন্ধু।

উত্তর দিল সাজ্জাদ, জি।

আফ্রিকার গহীন অরণ্যে যাচ্ছ কবে?

প্রশ্ন করা হলো বল্টুকে। বল্টুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছ নাকি?

জি।

পায়ে হেঁটেই যাবে?

জি।

প্রথমেই একেবারে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে? এই দেশটা একবার দেখে নিলে হতো না?

বল্টু বলল, এই দেশ আমরা পরে দেখব।

আমার মনে হয় প্রথমে নিজের দেশটাই দেখা উচিত। আমি হলে তা-ই করতাম। বসো, তোমরা ওই চেয়ারে বসো।

ওরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেটে করে সন্দেশ চলে এল। বড়চাচা বললেন, খোকনের সঙ্গে তো আজ দেখা হবে না। ও আজ সারা দিন ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। সাজ্জাদ ও বল্টু দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। বড়চাচা বললেন, জিজ্ঞেস করো কেন খোকন আসবে না? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বড়চাচা বললেন, ও কাল রাত নটার পর বাড়ি ফিরেছে, সেজন্যে শাস্তি। বুঝতে পারছ?

জি পারছি।

তোমরা ছাড়া আর কে কে যাচ্ছে। সব মিলে ছজন না?

জি-না, পাঁচজন। টগর আজ সকালে বলেছে সে যাবে না।

যাবে না কেন?

ওর নাকি ভয় লাগছে।

তাহলে তোমরা এখন ভয়াল-পাঁচ?

জি।

আমার তো মনে হয় আরও কমবে। শেষমুহূর্তে অনেকেই পিছিয়ে পড়বে। শেষমুহূর্তে অনেকের সাহস থাকে না। খাও, সন্দেশ খাও।

সাজ্জাদ সন্দেশ খেতে খেতে চারদিকে তাকাল। সিনেমায় বড়লোকদের বাড়ি যেরকম সাজানো থাকে সেরকম সাজানো। লাল টুকটুক কার্পেট। ময়লা জুতা পরে কেউ নিশ্চয়ই এ কার্পেটে পা দেয় না। কার্পেট থেকেই লালাভ একটি আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরের দেয়াল ঘেঁসে উঁচু উঁচু চেয়ার। চেয়ারের গদিগুলিও লাল রঙের। মাঝখানের মস্ত টেবিলটি কি পাথরের তৈরি? খোকনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সন্দেশ খাচ্ছ না কেন? যে কটি খেতে পারো খাও।

গবগব করে পাঁচ-ছটা সন্দেশ শেষ করে দেওয়াটা অভদ্রতা হবে ভেবেই বল্টু ইতস্তত করছিল। বড়চাচা বললেন, খেতে ইচ্ছে হলে খাবে। না খাওয়ার মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই।

সাজ্জাদ একসঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে দিল। মিষ্টির ভেতরও যে এমন সুন্দর গন্ধ থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। এ মিষ্টিগুলি কি বাড়িতেই তৈরি হয়। সাজ্জাদের হঠাৎ করে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে হলো। খোকনদের মতো বড়লোক। বড়চাচা বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা যাও। খোদা হাফেজ।

বল্টুর ইচ্ছে হলো এগিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলে। মুরুব্বিদের সঙ্গে হাঠাৎ দেখা হলে যেরকম করা হয়। কিন্তু সাহসে কুলাল না। যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বড়চাচা আবার ডাকলেন, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমরা কি মিছিলে যাও? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, ভয়াল-ছয়ের সদস্যরা মিছিলে যায়?

সাজ্জাদ ইতস্তত করে বলল, ওরা যায় না, আমি যাই।

কেন যাও?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না।

এসব মিছিল-টিছিল কেন হচ্ছে জানো?

জানি।

কেন?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না। বড়চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, না, তুমি জানো না। মিছি-টিছিল করা এখন আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা। এসব কী? রাতদিন রাস্তায় চেঁচামেচি করলে মানুষ কাজ করবে কখন?

সাজ্জাদ কিছু বলল না। বড়চাচা হঠাৎ করে কেন রেগে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না।

আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতেছে, ভালো কথা। কিন্তু এমন করছে যেন তারা যা বলবে তাই। আরে বাবা, পাকিস্তানের কথাও তো শুনতে হবে। হবে কি না বলো?

সাজ্জাদ না বুঝেই মাথা নাড়ল।

শেখ সাহেবের যে পরিকল্পনা তাতে তো দেশটাই ছারখার হবে। পাকিস্তান আনার জন্যে আমরা কম কষ্ট করেছি। এখন পাকিস্তানের কথা বলে না, সবাই শুধু বাঙালি বাঙালি করে। বাঙালি ছাড়াও তো লোক আছে। পাঞ্জাবি আছে, সিন্ধী আছে, এরা মানুষ না। সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা যায় না।

জি যায়।

বড়চাচা গলা উচিয়ে বললেন, মিছিল-টিছিলে কখনো যাবে না। এখন পড়াশোনায় সময়। পড়াশোনা করবে। ব্যস। কথায় কথায় মিছিল–এসব কী? যাও বাড়ি যাও।

৩. ছুটির দিনে খোকন

ছুটির দিনে খোকন সাধারণত খুব ভোরে ওঠে। বই নিয়ে পড়তে হবে না এই আনন্দেই ঘুম ভেঙে যায় সকাল সকাল। এখন সবদিনই ছুটি। অনেকদিন ধরে স্কুল হচ্ছে না। তবু এ বাড়ির নিয়মে ছুটি মাত্র একদিন–শুক্রবার। সেদিন ঘুম থেকে ওঠার জন্যে কেউ ডাকডাকি করবে না। কেউ যদি সারা দিন ঘুমাতে চায় তাহলে তাও পারবে। ছোটরা বাড়ির ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি করলেও তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকলেও কেউ বলবে না-যাও, ঘুমুতে যাও। সেদিন হচ্ছে স্বাধীনতার দিন।

আজ শুক্রবার। খোকন জেগে উঠেছে খুব ভোরে। তার ইচ্ছে হলো কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে। এরকম সুন্দর একটি ঝকঝকে দিনে তাকে ঘরে বসে থাকতে হবে। তাছাড়া আজ দুপুরে স্কুলের বারান্দায় ভয়াল-ছয়ের একটি গোপন জরুরি মিটিং বসবে। সে মিটিং-এ সবাই থাকবে, শুধু সে থাকবে না। সবাই হয়তো ভাববে সে আর ভয়াল ছয়ে নেই। তাকে বাদ দিয়েই আজ নিশ্চয়ই সব ঠিকঠাক হবে। খোকন হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রতনের মা এসে একবার জিজ্ঞেস করল–নাশতা ঘরে দিয়ে যাবে কি না। খোকন বলল, সে আজ নাশতা খাবে না, তার খিদে নেই। রতনের মা দ্বিতীয়বার কিছু বলল না। শুক্রবার খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা নিষিদ্ধ। কেউ খেতে চাইলে খাবে না। রতনের মা দুমিনিট পরেই আবার এসে হাজির।

দাদাভাই, আপনেরে ডাকে।

কে ডাকে?

আপনের আম্মা।

খোকনের মার শরীর মনে হয় আজ অন্যদিনের চেয়েও খারাপ। মাথার নিচে তিন চারটা বালিশ দিয়ে তাকে শোয়ানো হয়েছে। মুখ রক্তশূন্য। ঘরের বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। চারদিক অন্ধকার। খোকন ঘরে ঢুকতেই তিনি নিচুগলায় বললেন, কাল বিকেলে তোকে খুঁজছিলাম, কোথায় ছিলি?

মায়ের সামনে খোকন মিথ্যা বলতে পারে না। সে মৃদুস্বরে বলল, বাইরে ছিলাম।

মিছিল-টিছিলে যাস নাই তো?

না।

ঝামেলার মধ্যে যাবি না, কেমন?

আচ্ছা।

বস্ এখানে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই তো আমার ঘরে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিস।

খোকন বসল। খোকনের মা বললেন, একটা কমলা খাবি?

না।

না কেন, খা একটা।

তিনি একটি কমলা বের করে দিলেন।

আমার কাছে দে, আমি ছিলে দিচ্ছি।

আমি ছিলতে পারব।

দে আমার কাছে।

খোকনের মা কমলা ছিলতে লাগলেন। কিন্তু দেখে মনে হলো এটুকু কাজ করতেই তার খুব কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি টেনে টেনে বললেন, মিস গ্রিফিন বলছিল গণ্ডগোল নাকি প্রায় মিটমাটের দিকে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নাকি শেখ মুজিবের মিটমাট হয়ে গেছে। এখন নাকি শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবে।

খোকন কিছু বলল না।

মিটমাট হয়ে গেলেই হয়। মনে একটা শান্তি পাওয়া যায়। তাই না খোকন।

হ্যাঁ।

কিন্তু তোর বাবা বলছিল, এত সহজে নাকি কিছু হবে না। পাকিস্তানিরা নাকি চায় না শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়। আমি এখন কার কথা বিশ্বাস করি?

খোকন উঠে দাঁড়াল।

মা এখন যাই।

বোস না আরেকটু, বোস।

পরে আসব।

আচ্ছা আসিস। মিছিল-টিছিলে যাস না কিন্তু, লক্ষ্মী বাবা।

বললাম তো আমি যাই না।

ওইসব বাচ্চাছেলেদের জন্যে না।

খোকন নিজের ঘরে এসে মুণ্ডুহীন লাশ পড়তে বসল। মঞ্জুর কাছ থেকে বহু সাধ্য সাধনা করে আনা হয়েছে। কিন্তু পড়তে ভালো লাগছে না। খোকন বই বন্ধ করে জানালার পাশে বসে রইল। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে টুনুকে। তার জন্যেই ঘুর ঘুর ব্রছে বোধহয়। যারা সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে তাদের মতো সুখী বোধহয় আর কেউ নেই। কেউ তাদের আটকে রাখে না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। এই যে সাজ্জাদ, মিছিল দেখলেই ঢুকে পড়ে। কেউ তাকে কিছু বলে না। একদিন একা একা গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে এল।

খোকন জানালা বন্ধ করে দিল। বাইরে তাকিয়ে থাকতেও খারাপ লাগছে। দোতলার সিড়িতে অনজু আর বিলু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। খোকন কড়াগলায় ধমক দিল, গোলমাল করিস না। ওরা গোলমাল করতেই লাগল। করবে জানা কথা। আজ ছুটির দিন। ওরা কোনো কথা শুনবে না। খোকন ভাবল, ছাদে গিয়ে বসে থাকবে। চুপচাপ।

ছাদে যাবার পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার কি অসুখ করেছে?

জি-না।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে বাতি জ্বলছিল, কী করছিলে?

কিছু করছিলাম না।

জেগে ছিলে নাকি?

জি।

জেগে ছিলে অথচ কিছুই করছিলে না?

বাবা খুবই অবাক হলেন। বোকনের বাবা রকিব সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার। ইতিহাস পড়ান। তিনি খুব সহজে অবাক হতে পারেন। তাঁর বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যেমন, প্রায়ই খোকনের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। সেসময় তাকে তুমি তুমি করে বলেন। অন্যসময় তুই করে।

খোকন ঠিক করে বললো তো তোমার শরীর খারাপ করেনি তো?

জি-না।

দেখি এদিকে এসো, জ্বর আছে কি না দেখি।

তিনি খোকনের কপালে হাত রাখলেন।

না, জ্বর নেই তো।

রকিব সাহেব আবার অবাক হলেন। যেন জ্বর না থাকাটাও অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে, কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলে নাকি?

হ্যাঁ।

আমাকে বলতে চাও? বলতে চাইলে বলতে পারো।

খোকন ইতস্তত করতে লাগল। বাবা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মাঝে মাঝে খোকনের প্রতি তার আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। খুব খোঁজখবর করেন। তারপর আবার আগ্রহ কমে যায়। বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুই আর মনে থাকে না।

আমরা ছয়জন বন্ধু মিলে একটা দল করেছি। দলের নাম ভয়াল-ছয়।

বলো কী! খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। দলের কাজ কী?

আমার ভূ-পর্যটন করব।

ভূ-পর্যটন করবে?

হ্যাঁ। প্রথমে যাব আফ্রিকা।

বাহ, বেশ মজার তো।

বাবা এবার আর অবাক হলেন না। হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ছোটবেলায় আমিও একটা দল করেছিলাম। আমাদের দলের কাজ ছিল গুপ্তধন খুঁজে বের করা। কোনো গুপ্তধন আমরা খুঁজে পাইনি। তখন আমার বয়স ছিল বারো কি তেরো। তোমার এখন কত বয়স?

তেরো বছর তিন মাস।

এই বয়সটাই হচ্ছে দল করবার বয়স।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

কবে যাচ্ছ আফ্রিকায়?

এখনো ঠিক হয়নি।

তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলা দরকার। আমরা সবসময় শুধু পরিকল্পনা করি। কাজ আর করা হয় না। তোমরা যদি একদিন সত্যি সত্যি হাঁটতে শুরু করো, তাহলে ভালোই হবে। মাইল দশেক যেতে পারলেও অনেক কিছু শিখবে।

বাবা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। খোকন বুঝতে পারল না এখন তার কী করা উচিত। চলে যাওয়া উচিত না দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। কারণ বাবার অন্যমনস্কতা খুব বিখ্যাত। একবার শুরু হলে দীর্ঘ সময় থাকে। তখন কাউকে চিনতে পারেন না।

খোকন।

জি।

ছুটির দিনে তুমি তোমার দলের সঙ্গে না থেকে ঘরে বসে আছ কেন?

বড়চাচা বলেছেন আজ কোথাও বেরুতে পারব না।

ও আচ্ছ। কারণটা কী?

খোকন কারণ বলল। রকিব সাহেব বললেন, শাস্তিটা একটু মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। তোমার কী মনে হয়?

খোকন কিছু বলল না।

তোমার বড়চাচা হয়তো ভেবেছেন তুমি মিছিল-টিছিলে গিয়েছ, সেজন্যেই এমন শাস্তি। তুমি গিয়েছিলে নাকি?

না।

কখনো যাওনি?

খোকন চুপ করে রইল।

কয়েকবার গিয়েছ, তাই না?

হ্যাঁ।

আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, মিছিল করবে যুবকরা। মিছিল হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। এ কাজটি যুবকদের জন্যে। শিশুরা শিখবে, যুবকরা কাজ করবে, বৃদ্ধরা ভাববে। ঠিক না?

হ্যাঁ।

রকিব সাহেব হঠাৎ করে খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন?

আমি জানি না। এ নিয়ে কখনো ভেবেছ?

না।

আমি অবশ্যি অনেক ভেবেছি। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া ওদের উপায় নেই। ইলেকশনে জিতেছেন। কিন্তু ওরা করতে চাহে না। ওদের অজুহাত বের করতে হবে। কী অজুহাত দেবে সেটাও একটা সমস্যা। সমস্যা নয়?

হ্যাঁ।

এদিকে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমার দল সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। তার মানে কী বলতে পারো?

না।

ভুট্টো সাহেবই পাকিস্তানকে দুটি অংশ হিসেবে ভাবছেন। অথচ তারা দোষ আমাদের। ভাবখানা এরকম যেন আমরাই পকিস্তানকে দুভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি।

আমরা চাচ্ছি না?

ওরা যা শুরু করেছে তাতে চাওয়াই উচিত। আমি অন্তত চাই। তবে যারা একসময় পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন, দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, তারা নিশ্চয়ই চান না। যেমন তোমার বড়চাচা।

বড়চাচা চান না?

মনে হয় না। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

শেষপর্যন্ত কী হবে? পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবে?

নির্ভর করছে ওদের ওপর। ওরা যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে তাহলে হয়তোবা ওদের সঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিস্থিতি ভালো না।

বাবা কথা শেষ না করেই চটি ফটফট করে তার ঘরে ঢুকে গেলেন। খোকন চলে গেল ছাদে। এ বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। রোজ বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলে অনজু আর বিলু। চুন দিয়ে ঘর আঁকা আছে।

খোকন বেশ খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছিল না। আবার নিচে যেতেও ইচ্ছা করছিল না। একসময় রতনের মা এসে বলল, এখন নাশতা দেই?

বললাম তো কিছু খাব না।

এক গ্লাস দুধ আইন্যা দিমু।

না।

আপনেরে আম্মা ডাকে।

একটু আগেই গেলাম। আবার?

হ্যাঁ। আসেন আমার সাথে।

খোকন দেখল তার মা হাঁপাচ্ছেন। অসুখ বোধহয় খুব বেড়েছে। খোকন বলল, মা ডেকেছ?

হ্যাঁ, তুই নাকি কিছু খাস নাই? কেনরে ব্যাটা, কারও উপর রাগ করেছিস?

না।

আমি তো কোনো খোঁজখবর করতে পারি না। কী খাস না-খাস কে জানে!

আমি ঠিকই খাই।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, রতনের মা, যাও তো খোকনের খাবার নিয়ে এসো। আমার সামনে বসে সে খাবে। খোকনের একবার ইচ্ছা হলো বলে, ছুটির দিনে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। বড়চাচার নিষেধ আছে। কিন্তু সে কিছু বলল না। মাকে কষ্ট দিতে তার কখনো ইচ্ছা করে না। মা এত ভালো।

৪. ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্য

ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্যকে স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তিনজনই অত্যন্ত বিমর্ষ। টুনু একটা ঘাসের ডাটা চিবুচ্ছে। সাজ্জাদ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। দলের বাকি সদস্যদেরও এসে পড়ার কথা। কেউ আসছে না। সময় সকাল দশটা। রোদ উঠেছে কড়া। বেশ গরম লাগছে। টুনু বলল, চল ছায়াতে দাড়াই। কেউ জবাব দিল না। ওইদিন টুন কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না।

এক জায়গায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তারা পাচিলে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল। পাঁচিলে ওঠা নিষেধ। হেড স্যার খুব রাগ করেন। কিন্তু আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। হেড স্যারের এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যাবে। বল্টু হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, মুনির আসছে। তিনজনেই তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। মুনির হনহন করে আসছে। তার হাতে কী একটা বই। গল্পের বই নিশ্চয়ই। ওদের দেখতে পেয়েই সে বই শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেলল। মুনিরের সঙ্গে ওদের তেমন ভাব নেই। যে ছেলে প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তার সঙ্গে কারও ভাব থাকে না। ক্লাস টিচার সোলায়মান স্যারের ধারণা, মুনিরের মতো ভালো ছাত্র এই স্কুলে এর আগে আর ভর্তি হয়নি। পরে হবে না। গত বৎসর স্কুল ম্যাগাজিনে তার একটা ইংরেজি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম–দি বেগার বয়। হেড স্যার সেই গল্প আবার স্কুল অ্যাসেম্বলীতে পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, ক্লাস সেভেনের ছেলের ইংরেজি দেখলে? বিএ এমএ পাসরাও এমন লিখতে পারবে না। এর গল্পের মরালটা লক্ষ করবে–যে ছেলে ভিক্ষা করে তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।

মুনির স্কুল গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সন্দেহভরা গলায় বলল, অ্যাই, তোরা কী করছিস?

কিছু অছি না।

ওয়ালের উপর বসে আছিস কেন? হেড স্যার নিষেধ করেছেন না?

আমরা কারও নিষেধ মানি না।

ও, তোরা তো আবার ভয়াল-ছয়।

ভয়াল-ছয়টা মুনির এমনভাবে বলল যেন খুব একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাজ্জাদ চুপ করে রইল। দলের কথাটা এরকম জানাজানি হলে কী করে কে জানে। মুনির নিষেধ না মানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই।

না থাকলে নাই। আমরা নিষেধ মানি না।

কোনো নিষেধ মানি না?

না। তোর শার্টের নিচে এটা কী বই?

রাতের আতঙ্ক। এটা আমি কাউকে দিতে পারব না। এখনো পড়া হয়নি।

তোর বই আমরা চাই না।

তারা চুপ করে গেল। মুনির চলে যাচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে। বল্টু বলল, তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

তুই কী করছিস?

আমি যা-ই করি তাতে তোর কী?

মুনির ইতস্তত করে বলল, আমাকে দলে নিলে এই বইটা পড়তে দেব।

সে শার্টের ভেতর থেকে বই বের করল। মোটা একটা বই। মলাটে মুখখাশপরা একটা মানুষের ছবি। তার হাতে পিস্তল। অন্য হাতে লম্বা একটি বর্শা।

কি, নিবি আমাকে দলে?

ভালো ছাত্রদের আমরা দলে নিই না।

কেন? ভালো ছাত্ররা কী দোষ করল?

ভালো ছাত্ররা পড়াশোনা করবে। আমরা পড়াশোনা করব না।

কী করবি তাহলে?

দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

আমিও ঘুরব তোদের সাথে।

মুনিরকেও দেখা গেল দেয়ালের ওপর উঠে বসেছে। ভয় পাওয়া গলায় বলল, পড়ে যাব না তো?

কেউ উত্তর দিল না।

আমাকে দলে নিয়েছিস?

ভেবে দেখি। দলের অন্যরা যদি রাজি হয়।

অন্যরা কখন আসবে?

আসবে এক্ষুনি।

কিন্তু দলের অন্যদের আসার আগেই স্কুলের দপ্তরি কালিপদ এসে বলল, হেড স্যার আপনাদের ডাকে। টুনুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সাজ্জাদ বিড়বিড় করে বলল, হেড স্যার কোত্থেকে এলেন? কালিপদ তার জবাব দিল না। হাত ইশারা করে দেখাল। হেড স্যার হোস্টেলের বারান্দায় লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের ভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর।

হেড স্যার প্রথম কিছু সময় কোনো কথাই বললেন না। তারা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও যেন চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘ গর্জন করলেন।

ওয়ালের উপর বসে ছিলি কেন?

কোনো জবাব নেই।

তোর হাতে ওটা কী বই?

রাতের আতঙ্ক।

এসব আজেবাজে বই পড়তে নিষেধ করেছি, মনে নাই?

সবাই চুপচাপ।

তোদের বলি নাই–এখন চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে এখন ঘরে বসে থাকবি? পাঠ্যবই পড়বি। ট্রান্সলেশন করবি।

জি স্যার, বলেছেন।

দু বছর পর এসএসসি পরীক্ষা। খেয়াল আছে? শাহজাহান বল তো, রাইনোসেরাস মানে কী?

গণ্ডার স্যার।

রাইনোসেরাস বানান কর।

শাহজাহান টেনে টেনে বলল, আর ওয়াই...। বলেই থেমে গেল। হেড স্যার আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুনির ফিসফিস করে বলল, স্যার আমি বলব?

না, তোমার বলতে হবে না। যাও, এখন ঘরে যাও। খবরদার কোনো মিছিলে টিছিলে যাবে না।

জি আচ্ছ, স্যার।

আর এই বইটা রেখে যাও আমার কাছে। ম্যাট্রিক পাস করার আগে কোনো আউট বই পড়বে না। যেসব বই পড়ে কিছু শেখা যায় না সেসব বই পড়ার কী মানে? বলো কোনো মানে আছে?

নাই, স্যার।

যাও, বাড়ি যাও। আর এই তুমি, ঘাস চিবাচ্ছ কেন? ঘাস খায় ছাগলে। তুমি কি ছাগল? বলো, তুমি ছাগল?

টুনু মুখ কালো করে বলল, জি-না স্যার।

ঘাস-লতাপাতা এসব যেন আর খেতে না দেখি। যাও, বাড়ি যাও।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে টুনু বলল, সে বাড়ি চলে যাবে। সাজ্জাদ বলল, যেতে চাইলে যা, তোকে আমরা বেঁধে রেখেছি?

এটা রাগের কথা। এরপর যাওয়া যায় না। এই সময় একটা বেশ বড়সড় মিছিল আসতে দেখা গেল। সমুদ্রগর্জনের মতো গর্জন, জেগেছে জেগেছে বীর জনতা জেগেছে, জাগো জাগো জাগো, বীর জনতা জাগো। সাজ্জাদ বলল, যাবি নাকি মিছিলে?

কেউ কিছু বলল না। শুধু মুনির বলল, না, স্যার নিষেধ করেছেন।

ওরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মিছিলটাও প্রকাণ্ড। শেষই হতে চায় না। পেছনে চার-পাঁচটা পুলিশের ট্রাক। দেখলেই কেমন ভয় লাগে। মুনির ফিসফিস করে বলল, খুব গণ্ডগোল হবে। চল বাড়ি যাই।

তোর ভয় লাগে, তুই যা।

কত পুলিশ, দেখেছিস?

পুলিশকে ভয় পেলে তুই চলে যা। তোকে ধরে রেখেছি নাকি?

মুনির ইতস্তত করে বলল, হেড স্যার দেখলে খুব রাগ করবেন। তাছাড়া বাসায় আজ বড় খালামণির আসার কথা। বড় খালামণি আমাকে না দেখলে খুব রাগ করেন।

সাজ্জাদ বলল, তোর আসলে ভয় লাগছে। ভীতুর ডিম কোথাকার!

মুনির মুখ কালো করে ফেলল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না। গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। মুনিরের সাথে টুনুও চলে গেল। তার নাকি পেট ব্যথা করছে। সাজ্জাদ বলল, বল্টু, তুইও যাবি নাকি?

নাহ।

কী করবি তাহলে? মিছিলের সাথে যাবি?

হুঁ। কিন্তু কিছু হয় যদি?

দূর, কী হবে?

ভয়াল-ছয়ের দুই সদস্য মিছিলে ঢুকে পড়ল। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। একেকটা ঘামে ভেজা মুখ কী ভয়ঙ্কর রাগী। মিছিল যতই এগোচ্ছে মানুষের সংখ্যা ততই বাড়ছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মিছিল কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সাজ্জাদ আর বল্টু হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। হঠাৎ কে একজন পেছন থেকে বল্টুর শার্টের কলার চেপে ধরল। বল্টু ঘাড় ফিরিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জামিল স্যার! অঙ্ক করান, দারুণ রাগী। স্যারের এক হাতে একটা লাল নিশান।

তোরা এখানে কী করছিস? যা, এক্ষুনি বাড়ি যা। এটা হাওয়া খাওয়ার জায়গা। আর কে কে আছে তোদের সাথে?

আর কেউ নেই, স্যার।

ঠিক করে বল।

না স্যার, আমরা দুজনই।

এক্ষুনি বাড়ি যা, খুব গণ্ডগোল হবে। ওই গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়। এক্ষুনি। এক্ষুনি। খুব গণ্ডগোল হবে। দৌড়া। দৌড়া।

স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথাও কিছু একটা হলো। দারুণ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। ঢেউয়ের মতো মানুষের স্রোত আসতে লাগল। দুম দুম শব্দ হলো সামনে। গুলির শব্দ না টিয়ার গ্যাস? কয়েকজন প্রাণপণে চিৎকার করছে, আগুন আগুন! কোনোদিকে নড়ার রাস্তা নেই তবু এর মধ্যেই সাজ্জাদ প্রাণপণে ছুটছে। বল্টু তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। কালো কোট গায়ে দেওয়া একটা লোক বলল, এই খোকারা, মাটিতে শুয়ে পড়ো। দেখছ কী? গুলি হচ্ছে। ওরা কী করছে নিজেরা বুঝতে পারছে না। একজন বুড়ো মানুষ বললেন, কোনো ভোলা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়ো। কোনো বাড়ির দরজা খোলা নেই। সাজ্জাদের মনে হলো সে আর দৌড়াতে পারছে না। ডান পায়ের নখ উঠে গেছে বা কিছু হয়েছে। এবার পেছন থেকে দ্রিম দ্রিম শব্দ আসছে।

একতলা একটি বাড়ির গেটে বুড়ো মানুষ একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে ওদের ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

সেদিন ছিল পহেলা মার্চ। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছে সকাল এগারোটায়। বারোটা নাগাদ বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সেই জনসমুদ্র দেখে স্তজিত সরকার দুপুর একটায় ঘোষণা করল, বিকেল পাঁচটা থেকে কার্ফু। কেউ ঘর থেকে বেরুবে না। সেই ঘোষণা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেওয়া হলো, কার্ফু

বেলা তিনটা থেকে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। রাস্তায় দেখামাত্র তাদের গুলি করা হবে।

সাজ্জাদ এবং বল্টু আটকা পড়ে গেল একটা অচেনা বাড়িতে।

৫. খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব

খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব ঢাকা এয়ারপোর্ট এসে পৌঁছলেন বিকেল তিনটায়। চারদিক কেমন থমথম করছে। প্রচুর পুলিশ। এয়ারপোর্ট থেকে কেউ বেরুতে পারছে না।

আমিন সাহেবকে নেওয়ার জন্যে কেউ আসেনি। রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। কাস্টমসের একজন অফিসার বললেন, শহরে কার্ফু জারি হয়েছে। তবে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমিন সাহেব দুঘন্টা অপেক্ষা করলেন। কোনো ব্যবস্থা হলো না। খোকনের ছোটচাচি রাহেলা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। কারণ প্রিসিলার হঠাৎ শরীর খারাপ করেছে। দুবার বমি হয়েছে। জ্বর আসছে মনে হয়। ওকে ডাক্তার দেখানো উচিত। রাহেলা বললেন, এখন আমরা কী করব? সারা রাত এয়ারপোর্টে বসে থাকব নাকি?

অন্যরা যদি বসে থাকে আমরাও থাকব।

এ আবার কী ধরনের কথা? লোকজনদের সঙ্গে কথাটথা বলে দেখো কিছু করা যায় কি না।

আমিন সাহেব দুএক জায়গায় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলেন। কোনো লাভ হলো না। লাইন নষ্ট বা কিছু একটা হয়েছে।

এয়ারপোর্টে বেশ কিছু লোক আটকা পড়েছে। একটি আমেরিকান ফ্যামিলিকে দেখা গেল খুব চিন্তিত। ভদ্রলোকের নাম পিটার কল। তিনি যেচে এসে আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন, তোমাদের শহরের অবস্থা তো ভয়াবহ মনে হচ্ছে।

হুঁ।

আন্দোলন হচ্ছে শুনেছিলাম, এতটা বুঝতে পারিনি।

নরওয়ে থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি শহরে ঢুকতে চান না। পর ফ্লাইটে নরওয়ে চলে যেতে চান। ইংল্যান্ডের দুটি পরিবার আছে। ওদের সঙ্গে তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলি সমস্ত এয়ারপোর্ট জুড়ে ছোটাছুটি করছে। বাচ্চাগুলির মাকেও মনে হলো বেশ হাসিখুশি। খুট খুট করে ছবি তুলছে।

আমিন সাহেব ফিরে এসে দেখলেন প্রিসিলা আবার বমি করছে। তার গায়ে বেশ জ্বর।

কিরে প্রিসিলা, খারাপ লাগছে?

নো, আই অ্যাম জাস্ট ফাইন।

রাহেলা বললেন, কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে না?

না। অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় মশাল মিছিল বের করছে। কেউ কার্ফু মানছে না। গুলিটুলিও হচ্ছে বোধহয়, শব্দ শুনলাম।

এখন আমরা কী করব?

বসে থাকো।

তোমাকে কতবার বলেছি দেশে ফেরার দরকার নেই। শুনবে না।

গণ্ডগোল হচ্ছে বলে নিজের দেশে ফিরব না?

এইরকম দেশে ফিরে লাভটা কী?

আমিন সাহেব প্রিসিলাকে কোলে নিয়ে বসলেন। প্রিসিলা রিনরিনে গলায় ইংরেজিতে বলল, গণ্ডগোল হচ্ছে কেন?

গণ্ডগোল হচ্ছে কারণ আমরা বাঙালিরা বলছি, আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। পাকিস্তানিরা মানছে না। ওদের ধারণা, আমরা মানুষ না।

রাহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, থাক, রাজনৈতিক বক্তৃতা মেয়েকে না শোনালেও হবে।

না শোনালে হবে না। এরা আন্দোলনের মধ্যে বড় হবে। এদের জানা দরকার এসব কী জন্যে হচ্ছে।

এখন না জানলেও হবে। এখন দয়া করে চুপ করে থাকো।

আমিন সাহেব চুপ করে গেলেন। প্রিসিলা বলল, এরকম ঝামেলা কতদিন চলবে?

বলা মুশকিল। অনেকদিন ধরে চলতে পারে। তবে শুরু যখন হয়েছে তখন একদিন একদিন শেষ হবে। শুরু হওয়াটাই শক্ত।

তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা। ইংরেজিতে বলো।

আমিন সাহেব ইংরেজিতে বললেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এখন থেকে তোমাকে বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে মা। ভালো করে বাংলা শিখে নাও।

হোয়াই ডেডি?

কারণ তুমি বাঙালি মেয়ে, সেইজন্যে।

রাহেলা বিরক্ত হয়ে বললেন, বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে না। তুমি কথাবার্তা ইংরেজিতে বলবে। নয়তো ইংরেজি ভুলে যাবে।

রাত আটটার দিকে একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল যেটা বিদেশীদের হোটেলে পোছে দেবে। আটকেপড়া বাঙালিদের সম্পর্কে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। আমিন সাহেব কথা বলতে গেলেন ওদের সঙ্গে। একজন পাকিস্তানি মিলিটারি অফিসারের দায়িত্বে বাসটি যাবে। আমিন সাহেবকে মিলিটারি অফিসারটি শান্তভাবে বলল, ব্যবস্থাটি ফরেনারদের জন্যে।

কিন্তু আমার মেয়েটি অসুস্থ।

অসুখ হোক আর যাই হোক, আমার কিছু করার নেই। এই অবস্থার জন্যে দায়ী আপনারা বাঙালিরা। এর ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের।

আচ্ছ, আমাদের না হয় কোনো একটা হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন।

একবার তো বলেছি এটা সম্ভব নয়।

কিন্তু আপনারা বিদেশীদের জন্যে তো করছেন।

হ্যাঁ, ওরা আমাদের অতিথি।

আমার মেয়েটিও বিদেশী। ওর জন্য আমেরিকায়। ও জন্মসূত্রে আমেরিকান। ওর আমেরিকান পাসপোর্ট আছে।

আপনি আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন। আর করবেন না।

আমিন সাহেব গম্ভীর মুখে ফিরে এসে দেখেন প্রিসিলাকে একটা টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। একজন রোগামতো ভদ্রলোক তাকে পরীক্ষা করছেন। রাহেলা বলল, উনি একজন ডাক্তার।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কী হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বমিটা বন্ধ করা দরকার। মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কোনো ওষুধপত্র নেই। আমিও আপনাদের মতোই আটকা পড়েছি।

ডাক্তার সাহেব থাকতে থাকতেই প্রিসিলা আরও দুবার বমি করল। ডাক্তার সাহেব বললেন, ওকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। আসুন, দেখা যাক একটা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করা গেল না। রাহেলা কাঁদতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার বললেন, এইজন্যেই দেশে আসতে চাইনি। তবু আসতে হবে। কী আছে এই দেশে?

আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, প্রিসিলা মা, তুমি কেমন আছ?

ভালো। জাস্ট ফাইন।

ভোর হলেই আমরা তোমার দাদুমণির বাড়ি চলে যাব।

ভোর হতে কত দেরি?

বেশি দেরি নেই।

ডাক্তার সাহেব প্রিসিলার কাছেই বসে রইলেন। তারা সবাই অপেক্ষা ক লাগলেন ভোরের জন্যে।

৬. সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে

সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকে পড়া এবং প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বাইরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বুড়ো ভদ্রলোক সদরদরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সব কটি জানালাও বন্ধ করা হয়েছে। চারদিকে গা চমকানো একটা অন্ধকার। বুড়ো লোকটি সাজ্জাদের দিকে তাকালেন। তার চোখে মোটা ফ্রেমের একটা চশমা। একটু রাগী চেহারা। গায়ে সাদা রঙের একটা চাদর। নুয়ে নুয়ে হাঁটেন।

তোমার নাম কী?

সাজ্জাদ।

আর তোমার নাম?

শাহজাহান।

তোমাদের ভয় লাগছে?

জি-না।

সাজ্জাদ, তোমার পা কেটে গিয়েছে দেখছি, ব্যথা করছে?

জি-না।

এসো আমার সাথে। পা ধুইয়ে ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি।

আমার কিছু লাগবে না।

বাজে কথা বলবে না। বাজে কথা আমি পছন্দ করি না। নীলু। নীলু।

সাজ্জাদ এবং টুনু দেখল, ওদের বয়েসী একটি মেয়ে এসে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, এই মেয়েটি আমার নাতনি। ওর নাম নীলাঞ্জনা। আর এদের একজনের নাম শাহজাহান, অন্যজনের নাম সাজ্জাদ। বলো তো নীলু কার নাম সাজ্জাদ?

সাজ্জাদ এবং শাহজাহান মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বুড়োটা পাগল নাকি? মেয়েটি কিন্তু ঠিকই সাজ্জাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বুড়ো মহাখুশি।

ঠিক হয়েছে। এখন যাও ডেটল নিয়ে আসো। তুলা আনো। আর সাজ্জাদ শোনো, তুমি বাথরুমে গিয়ে পা ধুয়ে আসো। নীলুর সঙ্গে যাও। নীল দেখিয়ে দেবে।

আমার কিছু লাগবে না।

একটা চড় লাগাব। যা বলছি করো।

সাজ্জাদ উঠে পড়ল। বাথরুমটা বাড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে। নীলু বলল, দাদুমণির রাগ খুব বেশি। তিনি যা বলেন তা সঙ্গে সঙ্গে না করলে খুব রাগ করেন।

সাজ্জাদ মুখ গোমড়া করে বলল, আমি কাউকে ভয় পাই না।

কাউকে না?

শুধু হেড স্যারকে ভয় পাই।

আমার দাদুমণিও তো হেড স্যার।

তাই নাকি?

হুঁ। অবশ্যি এখন রিটায়ার করেছেন।

এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না।

না। শুধু আমরা দুজন আর একটি কাজের মেয়ে আছে। সে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। আজকে আসেনি।

তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। এইবার সেভেনে উঠব।

সাজ্জাদ বানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, তুমি রাইনোসেরাস বানান করতে পারো?

নীলু অবাক হয়ে বলল, না, রাইনোসেরাস কী?

এক ধরনের গণ্ডার।

রাইনোসেরাস বানান করার দরকার কী?

কোনো দরকার নেই। আমি নিজেও জানি না।

পা ধুতে ধুতে সাজ্জাদের মনে হলো, এই ছোট্ট মেয়েটি মন্দ নয়। পায়ে পানি ঢালছে চোখ বন্ধ করে। সাজ্জাদ বলল, অ্যাই, চোখ বন্ধ করে পানি ঢালছ কেন?

রক্ত দেখতে পারি না যে, এইজন্যে। তোমার ব্যথা লাগছে?

না। আমার ব্যথা-টেথা লাগে না।

ইস, কী মিথ্যুক!

সাজ্জাদ ফিরে এসে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক মস্ত একটা জাবদা খাতা খুলে কা যেন লিখছেন। সাজ্জাদকে ঢুকতে দেখেই বললেন, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো?

ক্লাস সেভেনে।

সবাই এক স্কুলে পড়ো?

জি।

মিছিলে গিয়েছিলে নাকি?

জি-না।

আবার মিথ্যা কথা!

জি, গিয়েছিলাম।

বুড়ো লোকটি পাতা বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন, একটা জিনিস অপছন্দ করি, সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আমি সঙ্গে ধরতে পারি।

এই সময় বাইরের রাস্তায় খুব হইচই হতে লাগল। ঘণ্টা বাজিয়ে একটা দমকল গেল। লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। একটা ভারী ট্রাক গেল। সম্ভবত মিলিটারি ট্রাক। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, মনে হচ্ছে আজ রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাতে হবে। শোনো, নীলু আমাকে দাদুমণি ডাকে। তোমরাও তাই ডাকবে। এখন যাও, নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প করো। পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব। দাদুমণি খাতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

.

এদের বাড়িটি বেশ বড়। অনেকগুলি কামরা নীলুর দখলে। একটিতে নীলুর লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরি দেখে সাজ্জাদ ও বল্টুর আক্কেল গুড়ুম। একটা পুচকে মেয়ের এত বই! নীলু বলল, সব আমার দাদুমণি কিনে দিয়েছেন।

তুমি পড়েছ সবগুলি?

পড়ব না কেন?

বল্টু বলল, নীল আতঙ্ক পড়েছ? দারুণ বই!

না, পড়িনি।

আমি নিয়ে আসব তোমার জন্যে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নীল তার সমস্ত সম্পত্তি দেখিয়ে ফেলল। তাদের সবচেয়ে মজা লাগল দাদুমণির মিথ্যা খাতা দেখে। মিথ্যা খাতায় দাদুমণি সব মিথ্যা খবরগুলি তুলে রাখেন। খবরের শেষে মজার সব মন্তব্য লেখা থাকে। দুএকটা নমুনা দেওয়া যাক।

অদ্ভুত গাছ
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নোয়াখালীর ছাগলনাইয়াতে জনৈক আহমেদ আলীর একটি অদ্ভুত খেজুরগাছ দেখিবার জন্যে মানুষের ঢল নামিয়াছে। উক্ত খেজুরগাছটি নামাজের সময় সেজদার ভঙ্গিতে নুইয়া পড়ে। খেজুরগাছের এই অদ্ভুত কাল্পে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে না।

মন্তব্য : নোয়াখালীর ছাগলনাইয়াতে আমি নিজে গিয়েছিলাম। এই জাতীয় গাছের কোনো সন্ধান আমাকে কেহ দিতে পারে নাই। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারের আসল উদ্দেশ্য কী? বুঝিতে পারিতেছি না।

আমগাছে কাঁঠাল

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সম্প্রতি সাতক্ষীরার কুণ্ডচরণ বৈরাগীর একটি আমগাছে প্রকাণ্ড কাঁঠাল ফলিয়াছে। কুণ্ডচরণ আমাদের নিজস্ব সংবাদাতাকে জানান যে, উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসিতেছে। সাতক্ষীরা মহকুমার এসডিও সাহেবও আসিয়াছিলেন।

মন্তব্য : আমি সাতক্ষীরার এসডিও সাহেবকে একটি চিঠি লিখে জানতে পারি যে, তিনি নিজে সেই কাঁঠাল দেখেননি, তবে খবর শুনেছেন। আমি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার ঠিকানা জানতে চাই। সম্পাদক সাহেব আমাকে জানান, উক্ত সংবাদদাতা বর্তমানে ছুটিতে আছেন।

ছাগলের গর্ভে সর্পশিশু

সম্প্রতি একটি ছাগল দুটি সপশিশু প্রসব করিয়াছে। ঘটনাটি ঘটে ময়মনসিংহ জেলার নীলগঞ্জে। প্রসবের দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি সর্পশিশুর মৃত্যু ঘটে। তবে অন্যটি এখন সুস্থ আছে। ব্যাপারটি স্থানীয় জনগণের মনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

মন্তব্য : গাঁজাখুরির একটা সীমা থাকা দরকার।

নীলু হাসিমুখে বলল, দাদুমণি মিথ্যা কথা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

তিনি নিজে বুঝি সবসময় সত্যি কথা বলেন।

তা বলেন।

যখন আমাদের মতো ছোট ছিলেন তখনো বলতেন?

তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

সাজ্জাদ গম্ভীরভাবে বলল, তখন তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

নীল হেসে ফেলল। হাসি আর থামতেই চায় না। এই সামান্য কথায় কেউ এত হাসে নাকি?

একসময় তারা নীলুর পোষা ময়না দেখতে গেল। এই ময়নাটিকে নীলু নিজেই নাক কথা বলা শিখিয়েছে। এমনভাবে শিখিয়েছে যাতে মনে হয় ময়না বুঝি সত্যি সত্যি কথা বলে। কেউ কাছে গিয়ে দাড়ালেই ময়না বলবে, তোমার নাম কী? তোমার নাম কী?

নাম বলার পর ময়না দুএক মিনিট চুপ করে থেকে বলবে, তুমি কেমন আছ?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেই ময়না নেবে, ওগো বাড়িতে মেহমান এসেছে।

দারুণ মজার ব্যাপার।

কেলবেলা দাদুমণি বললেন, এইবার রান্নাবান্না শুরু করা যাক। কী খাবে তোমরা।

বল্টু গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের খিদে নেই।

এটা তো ঠিক বললে না। তোমার খিদে না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের নেই সে বুঝল কী করে?

নীল খিলখিল করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যার পর বল্টু বিনা নোটিসে কাঁদতে শুরু করল। দাদুমণি প্রথম কিছু ভাব করলেন যেন দেখতে পাননি। সাজ্জাদ খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তার ধারণা নীলু খুব হাসাহাসি করবে। কিন্তু নীলু হাসল না। সেও এমন ভাব করল যেন কিছু দেখতে পায়নি। শেষপর্যন্ত দাদুমণি বললেন, তোমার বোধহয় পেট ব্যথা করছে, তাই না? বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, হ্যাঁ।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাসার জন্যেও পহয় একটু খারাপ লাগছে। লাগছে?

লাগছে।

বাসায় তোমার কে কে আছেন?

আব্বা, আম্মা আর দাদি।

সকাল হলেই ওরা কার্ফু তুলে নেবে। তখন সবার আগে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব। কেমন?

বল্টু মাথা নাড়ল।

একটা তো মোটে রাত। দেখাত দেখতে কেটে যাবে। মাঝে মাঝে দেশের খুব বড় দুঃসময় আসে। তখন দেশের মানুষকে কষ্ট করতে হয়। এই যেমন আমরা করছি।

দাদুমণি কিছুক্ষণ থেমে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, এই গণ্ডগোল, মিছিল কেন হচ্ছে তোমরা জানো?

জানি।

কেন হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছে, সেইজন্যে।

কিন্তু এর আগেও তো আমরা অনেক মিছিল-টিছিল করেছি। করিনি?

করেছি।

সেগুলি কী জন্যে করেছি জানো?

সবাই চুপ করে রইল। দাদুমণি বললেন, তোমাদের এসব জানা উচিত। চোখের সামনে এত বড় একটা অন্দোলন হচ্ছে। কেন হচ্ছে জানা উচিত না?

জি।

আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি; গোড়ার কথাগুলি অনেকেই জানে না। সমগ্র পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে, এই জিসিটা জানো?

না।

একধরনের মানুষ হচ্ছে শোষক, যারা শোষণ করে। আর অন্যধরনের মানুষ হচ্ছে শোষিত। অর্থাৎ এদের শোষণ করা হয়। পাকিস্তানের জন্ম হলো মুসলমানদের নিয়ে। তখন শোষিত মানুষ ভাবল আর তাদের দুঃখকষ্ট থাকবে না। এইবার সুখ আসবে।

সুখ কিন্তু এল না। কারণ পাকিস্তানেও একদল আছে যারা শোষক। তারা ধনী, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। এদের বেশিরভাগই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি। দেশের রাজধানীও তার অংশে। কাজেই তারা জোরেসোরে শোষণ শুরু করল। এবং আমরা পূর্বপাকিস্তানের মানুষরা হলাম শোষিত। আমাদের শোষণ করতে লাগল তারা যাতে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। কাজেই আমরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আমাদের এই ঘৃণা তারা কখন প্রথম বুঝতে পারল জানো?

না, কখন?

ভাষা আন্দোলনের সময়।

ভাষা আন্দোলনের সময় তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল, আরে পূর্বপাকিস্তানের এই মানুষগুলি তো সহজ পাত্র নয়। কাজেই তারা এখন খুব সাবধান।

এবং আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয় এরা কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেবে না।

সাজ্জাদ হঠাৎ বলে বসল, আমাদের হাতে ক্ষমতা আসলে আমরাও কি শোষক হয়ে যাব?

যেতে পারি। হয়তো দেখা যাবে আমরা তখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ করতে শুরু করেছি। তখন হয়তো তারাও আন্দোলন শুরু করবে।

নীলু বলল, এসব শুনতে ভালো লাগছে না দাদুমণি। একটা ভূতের গল্প বলো।

দাদুমণি বললেন, এখন আর ভূতের গল্প বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ঠিক তখন কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। উত্তরদিক থেকে খুব হইচই হতে লাগল। দাদুমণি দরজা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, কোথায় যেন আগুন লেগেছে, উত্তরদিকে। বিরাট আগুন।

রাতের ভাত খাওয়ার সময় রেডিওতে বলল লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্বপাকিস্তানে আসছে।

বল্টু আবার কাঁদতে শুরু করল। দাদুমণি বললেন, কী হয়েছে বল্টু? পেট ব্যথা করছে।
না, বাসার জন্যে খারাপ লাগছে।

কার্ফু উঠলেই আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব।

বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, যদি কার্ফু না ওঠে?

৭. কার্ফু তোলা হলো

কার্ফু তোলা হলো সকাল নটায়।

চারদিকে কেমন ছমছমে ভাব। যেন কিছু একটা হবে। কী হবে কেউ ভাল কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। যুবকদের চেহারা একই সঙ্গে রাগী ও বিষণ্ণ।

এয়ারপোর্টে আমিন সাহেব মেয়েকে কোলে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন, বাসায় না গিয়ে মেয়েকে সরাসরি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান। বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। রাহেলা অস্থির হয়ে পড়েছেন, এতক্ষণেও নেওয়ার কোনো গাড়ি আসছে না কেন? তিনি বললেন, গাড়ি লাগবে না, চলো একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলে যাই।

এত মালপত্র কী করব?

পড়ে থাকুক।

বেবিট্যাক্সি, রিকশার সংখ্যা খুব কম। বহু কষ্টে একটি জোগাড় করা গেল। রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই। কিন্তু প্রচুর মানুষ। ছোট ছোট দল বানিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে ইপিআর-এর বড় বড় ভ্যান। ভ্যানের মাথায় মেশিনগান বসিয়ে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। আমিন সাহেব বললেন, দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। রাহেলা, অবস্থা দেখো।

তুমি দেখো। আমার দেখার শখ নেই।

এত সৈন্য নামিয়েছে শহরে, আশ্চর্য!

প্রিসিলা বলল, বাবা, আমি সৈন্য দেখব। রাহেলা ধমক দিলেন, সৈন্য দেখতে হবে। শুয়ে থাকো। আমিন সাহেব বললেন, ওকে দেখতে দাও। দেখে অভ্যস্ত হোক। এ দেশের অবস্থা জানতে হবে না তাকে।

না, জানার দরকার নেই। আমি এখানে থাকব না।

কোথায় যাবে?

আমেরিকা। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না। রাহেলা বললেন, এরকম দেশে মানুষ থাকতে পারে।

কেন, মানুষ থাকছে না? ওরা থাকতে পারলে আমরাও পারব। তাছাড়া অবস্থা এরকম থাকবে না।

কী করে তুমি জানো থাকবে না?

এটা জানা যায়। সব খারাপ সময়ের পর আসে সুসময়।

সুসময় আসুক আর যাই আসুক, আমি এখানে থাকব না। তুমি যেতে না চাও থাকবে। আমি প্রিসিলাকে নিয়ে চলে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না।

ফার্মগেটের সামনে এসে দেখা গেল প্রতিটি গাড়িকে থামানো হচ্ছে। দুজন মিলিটারি এসে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি গাড়িতে। কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করছে। আমিন সাহেবকে অবশ্যি কিছু বলল না। হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বলল। প্রিসিলা বলল, ওরা মিলিটারি, বাবা?

হুঁ।

কী দেখছে?

কী জানি কী? তোমার শরীর কেমন লাগছে এখন?

ভালো।

আবার বমি বমি লাগছে?

নাহ্।

বাড়িতে গেলেই দেখবে শরীর পুরোপুরি সেরে গেছে। বাড়িতে পৌঁছেই ডাক্তার আনাব। ঠিক আছে?

প্রিসিলা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল। বাড়ি পৌঁছতে অবশ্যি দেরি হলো অনেক। নীলক্ষেতের সামনে সমস্ত গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন দেওয়া হচ্ছে না তাও কেউ বলছে না। রাহেলা অসহিষ্ণু গলায় বললেন, কী হচ্ছে?

বুঝতে পারছি না তো।

আমি অসুস্থ মেয়ে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকব নাকি?

কিছু তো করার নেই। অপেক্ষা করা যাক। বোধহয় মিছিল-টিছিল আসছে।

আমি থাকব না এদেশে। আমি আগামী সপ্তাহেই চলে যাব।

রাহেলা কেঁদে ফেললেন।

.

খোকন বাড়ির সামনের গেটের কাছে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। তার খুব ইচ্ছা, সে ভয়াল-ছয়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু বড়চাচা বলে দিয়েছেন, কেউ যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যায়। দারোয়ন গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বড়চাচার হুকুম, ছাড়া তালা খোলার অনুমতি নেই। খোকন আশা করে আছে সাজ্জাদ বা বল্টু এদের কেউ তার খোঁজে আসবে। কিন্তু এখনো কেউ আসছে না। আসবে জানা কথা, কিন্তু এত দেরি। করছে কেন?

ছোটচাচা যখন বেবিট্যাক্সি থেকে নামলেন তখনো খোকন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। তবু সে বুঝতে পারল না যে ছোটচাচা এসে পড়েছেন। তিনি ডাকলেন, এটা কে, খোকন না? খোকনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

আমরা যে গতকাল আসছি সে টেলিগ্রাম পাসনি?

না তো।

যা, ভেতরে গিয়ে খবর দে।

খোকনের হুঁশ ফিরে এল, সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে এল। বহুদিন এ বাড়িতে এরকম আনন্দের ব্যাপার হয়নি।

৮. কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই

কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই সাজ্জাদ ও বল্টু বেরিয়ে পড়ল। দাদুমণি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন ত্তি তারা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না। তারা নাকি নিজেরাই যেতে পারবে। নালুরও দাদুমণিকে ছাড়ার ইচ্ছা নেই। বাসায় তার একা একা থাকতে ভয় লাগে।

দুজনে প্রথমে গেল বন্দুদের বাসায়, কাওরান বাজারে। বাসায় তখন প কান্নাকাটি হচ্ছে। তার মা সারা রাত কেঁদেছেন। তিনবার ফিট হয়েছেন। বাবা মা পাশেই একটা মোড়াতে বসে আছেন। বল্টুর বড় দুভাই কার্ফু ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছে। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আগামী রোববারেই আমি ছুটি নিয়ে সবাইকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব। ঝামেলা না মিটলে কাউকে ফিরিয়ে আনব না। বলতে বলতে তিনিও চোখ মুছতে লাগলেন।

সাজ্জাদ কী করবে ভেবে পেল না। চলে যাবে না আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। আবার এরকম কান্নাকাটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভালো লাগে না। বল্টুর বাবা বললেন, সাজ্জাদ, তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তোমার পাল্লায় পড়ে ছেলের আজ এই অবস্থা। বুঝতে পারছ? সাজ্জাদ মাথা নাড়ল।

যাও, এখন বাড়ি যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সাজ্জাদদের বাসা তেজকুনিপাড়া। সে থাকে তার বোন এবং দুলাভাইয়ের সঙ্গে। দুলাভাই লেদ মেশিন ওয়ার্কশপের একজন মেকানিক। লোকটি নিরীহ গোছের। সে নিশ্চয়ই

সাজ্জাদকে দেখে তেমন কিছু বলবে না। হয়তো বলবে, এই রকম ঘোরাফেরা করা ঠিক না। আর যাবে না। অবশ্যি তার বোন খুবই রাগ করবে। আজ সারা দিন হয়তো কথাই বলবে না। ঘনঘন চোখ মুছবে।

সাজ্জাদ তাদের বাসার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায় কি না। কোনো শব্দ নেই। কেউ কাঁদছে না। সে ঘরে ঢুকে দেখল তার বোন রান্নাঘরে। সাজ্জাদকে দেখেই সে বলল, তোর দুলাভাই কোথায়?

আমি তো জানি না।

তুই জানিস না মানে? তোর খোঁজে সেই সন্ধ্যাবেলা গেছে, আর তো আসে নাই।

কার্ফুর মধ্যে কোথায় গেল? আমি বললাম যাওয়ার দারকার নেই। তবু গেল।

সাজ্জাদের বোন সরুগলায় বলল, এখন কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে। বোকাসোকা মানুষ।

ফার্কুর মধ্যে আটকা পড়েছে আর কী। আসবে, আসবে এখুনি।

তারা দুই ভাইবোন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কেউ এল না। সাজ্জাদের বোন কান্নাকাটি কিছুই করল না। সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরের কাজ করতে লাগল। দুপুরের পর সাজ্জাদ খুঁজতে বেরুল।

তখন শহরে মিছিলের পর মিছিল বেরুচ্ছে। উত্তেজিত মানুষের মুখে একটিমাত্র কথা–শেখ সাহেবের ভাষণ হবে ৭ তারিখে। সেই ভাষণে দারুণ একটা কিছু বলবেন তিনি।

সাজ্জাদ নানান জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। ফার্মগেট, নীলক্ষেত, আজিমপুর। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে শুনল তার বোন ক্ষীণস্বরে কাঁদছে। দুলাভাই এখনো ফিরেননি।

৯. চায়ের জমকালো আয়োজন

খোকনের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা চায়ের একটা জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। খোকনের মা এবং প্রিসিলা ছাড়া আর সবাই এসে বসেছে খাবার টেবিলে। প্রিসিলার জর কমে গিয়েছে, তবে দুর্বল হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই সে ঘুমুচ্ছে। খোকনের একজন মামা পিজির বড় ডাক্তার। তিনি এসে দেখে গিয়েছেন এবং বলেছেন, তেমন কিছু নয়। ট্রাভেল সিকনেস। দুএকদিন পুরোপুরি রেস্টে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

চায়ের টেবিলে ছোটরা কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু আজ সবাই কথা বলছে। বড়চাচার মুখ হাসি হাসি। তার হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আজ আর তিনি রাগ করবেন না। ছোটচাচা একটির পর একটি মজার মজার গল্প বলে যাচ্ছেন–একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন আলাস্কা। সেখানে ঠান্ডায় নাকি হঠাৎ তার চোখের মণি জমে গেল। কিছুই দেখতে পান না। শেষকালে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে গরম করার পর আবার দেখতে পেলেন।

তারপর একবার স্কুভা ডাইভিং করতে গিয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে। পানির নিচে বেশিদূর যাননি, অল্প কিছুদূর গিয়েছেন। হঠাৎ তার মনে হলো, পেছন থেকে তাঁর বাহাত ধরে কে যেন টানছে। তিনি চমকে পেছন ফিরে দেখলেন একটা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড অক্টোপাস। অক্টোপাসটির সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। সেগুলি মার চারপাশে কিলবিল ছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব হওয়ার পর বড়চাচা ছোটদের উঠে যেতে বললেন। হাসিমুখে বললেন, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। এখন সবাই যাও। আমরা বড় কিছু কথা বলি। আজ আর পড়াশোনা করতে হবে না। আজ ছুটি।

এখন বড়দের গল্প মানেই দেশের কথা। কী হবে এই নিয়ে আলোচনা। তর্ক। এখানেও তাই হলো। সাত তারিখে কী বক্তৃতা হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগলেন সবাই। বড়চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, শেখ সাহেব যা করছেন তার ফল ভালো হবে না। পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি দেশকে দুই ভাগ করে ফেলবার চেষ্টা করছেন।

এরকম মনে করার তো কারণ নেই। আছে কোনো কারণ? ভুট্টো সাহেবরা যা করছেন সেটাই দেশকে দুভাগ করবে। নির্বাচনে যে জিতেছে সে ক্ষমতায় যাবে, এ তো সোজা কথা।

কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই তো দেশকে দুভাগ করার চেষ্টা করবে।

করবার আগেই সেটা বলছেন কেন? অজুহাতটা খুব বাজে না? দুর্বল অজুহাত না? ধরেন, আজ যদি ভুট্টো শেখ মুজিবের মতো নির্বাচনে জিতত তাহলে কি তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী করা হতো না?

বড়চাচা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন এবং রেগে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখন খোকন এসে বলল, বড়চাচা, আপনার সঙ্গে কথা বলব।

এখন না, পরে।

জি-না বড়চাচা, এখন। আমার সঙ্গে একটু বাইরের ঘরে আসেন। আসতেই হবে।

বড়চাচা বেশ অবাক হয়েই বাইরের ঘরে এসে দেখলেন সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে। সে তার শার্টের লম্বা হাতায় ঘনঘন চোখ মুছছে।

সাজ্জাদ না তোমার নাম? কী হয়েছে?

দুলাভাই হারিয়ে গেছেন–এই খবরটি বলতে সাজ্জাদের দীর্ঘ সময় লাগল। বড়চাচা নিঃশব্দে শুনলেন। শান্তস্বরে বললেন, কার্ফু ভঙ্গের জন্যে ধরে নিয়ে থানায় রেখে দিয়েছে। থানায় খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। তুমি কাঁদবে না, আমি খোঁজ করছি। তুমি কিছু খেয়েছ?

জি-না।

খাও কিছু। খোকন, তোমার বন্ধুকে কিছু খাবার দিতে বলো।

আমার খিদে নেই, আমি কিছু খাব না।

সাজ্জাদ তুমি খাও। আমি খোঁজ করছি। কী নাম তোমার দুলাভাইয়ের?

শমসের আলী।

বড়চাচা প্রথমেই ফোন করলেন রমনা থানায়।

আমি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী। আমার একটা খবর দরকার। গত রাতে কার্ফু চলার সময়ে শমসের নামের...।

বড়চাচা সব কটি থানায় ফোন করলেন। কেউ কোনো ধরব দিতে পারল না। শমসের আলী নামের কেউ গত রাতে গ্রেফতার হয়নি। বড়চাচা ক্রমেই গম্ভীর হতে শুরু করলেন। একসময় বললেন, নিজে না গেলে হবে না। খোকন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। সাজ্জাদ, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

বড়চাচা রাত দশটা পর্যন্ত নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করলেন। কোনোই খবর পাওয়া গেল না। তিনি রাগী গলায় বললেন, একটা লোক আপনাআপনি নিখোঁজ হয়ে যাবে? এটা একটা কথা হলো? বড়চাচার কপালে ভাঁজ পড়ল। সাজ্জাদ ক্রমাগত চোখ মুছছে। তিনি একসময় বললেন, পুরুষমানুষদের কাঁদতে নেই। কান্না বন্ধ করো। আমি তোমার দুলাভাইকে খুঁজে বের করব। এখানকার ডিসিএমএলএ আমার পরিচিত। কাল দেখা করব তার সঙ্গে। নাকি এখন যেতে চাও? সাজ্জাদ জবাব দিল না। তিনি বললেন, চলো, এখনই যাওয়া যাক।

ডিসিএমএলএ-কে পাওয়া গেল না।

১০. সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান

সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন রেসকোর্সের মাঠে। ভোররাত থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দোকানপাট বন্ধ। অফিস-আদালত কিছু নেই। সবার দারুণ উল্কণ্ঠা, কী বলবেন এই মানুষটি? সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব মন দিয়ে আজ শুনতে হবে তিনি কী বলেন। আজ তাকে পথ দেখাতে হবে। শোনাতে হবে অভয়ের বাণী।

হাজার হাজার মানুষ জমতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রেসকোর্সের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবাই অপেক্ষা করছে। বাবার কাঁধে চেপে এসেছে শিশুরা। অবাক হয়ে তারা দেখছে এই বিশাল মানুষের সমুদ্রকে।

বহুদূরে অপেক্ষা করছে সারি সারি মিলিটারি ভ্যান। চোখে সানগ্লাস পরা তরুণ অফিসারদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সম্মিলিত শক্তি ভয়াবহ শক্তি। ওরা কি বুঝতে পারছে সে-কথা? ঘনঘন কথা বলছে ওয়ারলেসে। মাথার ওপর দিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বিমান বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে। ওদের কপালেও ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। অপেক্ষা করছে তারাও।

সাজ্জাদ এসেছে খুব ভোরে। সে ঠিক বক্তৃতা শুনতে আসেনি। বক্তৃতা-টতা তার বিশেষ ভালো লাগে না। সাজ্জাদ এসেছে তার দুলাভাইয়ের খোঁজে। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো অলৌকিক উপায়ে তাকে হঠাৎ হয়তো পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, মাঠের প্রান্তে পা ছড়িয়ে

চীনাবাদাম খাচ্ছে। সাজ্জাদকে দেখামাত্র ডাকবে, অ্যাই যে, অ্যাই এই সাজ্জাদ। সাজ্জাদ বলবে, আরে দুলাভাই, আপনি এখানে!

এলাম, দেখি শেখ সাহেব কী বলেন।

এদিকে আপনার জন্যে আমরা অস্থির। আপা বাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তাই নাকি?

আবার বলছেন তাই নাকি। এসব কী কাণ্ড দুলাভাই! চলেন বাসায় যাই।

যাব যাব। বসো আগে বক্তৃতাটা শুনি। বাদাম খাবে?

না।

আরে খাও না। অ্যাই, অ্যাই বাদামওয়ালা।

বাস্তবে অবশ্যি সেরকম কিছুই হলো না। কত অসংখ্য মানুষ এসেছে। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও চেহারার কোনো মিল নাই। সাজ্জাদের হঠাৎ মনে হলো, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তো। সব পণ্ড দেখতে একরকম। দুটি শিয়ালের মধ্যে প্রভেদ কিছু নেই। মানুষরা কত আলাদা। কেন, এরকম কেন?

সাজ্জাদ চমকে পেছন ফিরল। খয়েরি রঙের একটা চাদর গায়ে দিয়ে হেড স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। সাজ্জাদের মনে হলো, সভাতে আসার জন্যে হেড স্যার প্রথমেই একটা প্রচণ্ড

ধমক দেবেন। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। স্যার অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, সাজ্জাদ, একটা খবর শুনলাম তোমার দুলাভাইয়ের সম্পর্কে, এটা কি সত্যি? ওনাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?

সত্যি, স্যার।

বলো কী? আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছ তো?

জি স্যার।

আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন?

সাজ্জাদ চুপ করে রইল। তার তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এক মামা আছেন কুড়িগ্রামে, পোস্টমাস্টার। নিকটআত্মীয় বলতে তিনি। তার সঙ্গে বহুদিন যাবত যোগাযোগ নেই। হেড স্যার বললেন, তোমাদের চলছে কীভাবে? সঞ্চয় তো মনে হয় তেমন কিছু তোমার দুলাভাইয়ের ছিল না। নাকি ছিল? সাজ্জাদ জবাব দিল না। হেড স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, কাল তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাসা চেনো তো?

চিনি স্যার।

সকালবেলা আসবে।

জি আচ্ছা।

এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু শুনতে পাবে না। আরেকটু সামনে যাওয়া দরকার। চলো সামনে যাই।

আপনি যান স্যার। আমি বাসায় চলে যাব।

সে-কী! ভাষণ শুনবে না?

জি-না স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। কাল সকালবেলা মনে করে আসবে। মনে থাকবে তো?

থাকবে স্যার।

সাজ্জাদ বাসায় গেল না। নীলুদের বাসার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। তার একটু লজ্জা করতে লাগল। এক সপ্তাহ পর আসছে এখানে। দাদুমণি খুব করে বলে দিয়েছিলেন একটা খবর দেওয়ার জন্যে।

দরজা খুলল নীলু। সে থমথমে গলায় বলল, খুব বকা খাবে দাদুমণির কাছে। দাদুমণি খুব রেগেছেন তোমার ওপর। আমাকে বলেছেন এলেও যেন ঢুকতে না দেই।

দাদুমণি অবশ্যি তেমন রাগ করলেন না। কিংবা রাগটা জমা করে রাখলেন, পরে করবেন। তিনি বললেন, তুমি আমি না-আসা পর্যন্ত থাকবে এখানে। আমি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাচ্ছি। নীলু বলল, সে তো দাদুমণি রেডিওতে শুনলেই হয়।

না, এসব জিনিস সভাতে উপস্থিত থেকে শুনতে হয়। রেডিওতে শুধু কথাগুলি শোনা যাবে। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মানুষের চোখেমুখে কী পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখা যাবে না। আমার কাছে বক্তৃতার চেয়ে এইসব জিনিসই দেখতে ভালো লাগে।

দাদুমণি চলে যাওয়া মাত্র নীলু বলল, তোমাদের কথা আমার রোজ মনে হয়েছে। আশ্চর্য, একবারও তোমরা এলে না।

এলাম তো।

এক সপ্তাহ পর এলে। দাদুমণি যতটুকু রাগ করেছে আমি তারচেয়েও বেশি রাগ করেছি। আমি কোনো কথাই বলব না।

আমার একটা বড় বিপদ হয়েছে। আমার দুলাভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না।

খুঁজে পাচ্ছ না মানে?

কার্ফুর রাতে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারপর আর ফিরে আসেননি।

সাজাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। নীল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। একসময় দেখা গেল সেও কাঁদতে শুরু করেছে। তার পোষা ময়না ক্রমাগত ডাকতে লাগল, কুটুম এসেছে, বসতে দাও।

ঠিক তখনই রেসকোর্সে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করলেন। তার মুখ দিয়ে কথা বলে উঠল বাংলাদেশ।

...আমি যদি তোমাদের কাছে না থাকি, তোমাদের উপর আমার আদেশ রইল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। রক্ত যখন দিতে শিখেছি আরও দেব। বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।

১১. মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে

মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রাহেলা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বেশ জ্বর গায়ে। জ্বরের আঁচে গাল লাল হয়ে আছে। অথচ সকালে বেশ ভালো ছিল। অনজু ও বিলুর সঙ্গে হইচই করে খেলেছে।

কেমন লাগছে মা?

ভালো লাগছে।

মাথাব্যথা করে।

নাহ।

শরীর খারাপ লাগছে না?

না তো।

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমরা নর্থ। ডাকোটায় চলে যাব।

আমি যেতে চাই না মা।

যেতে চাও না কেন? আমেরিকা তোমার ভালো লাগে না।

লাগে।

প্রিসিলা জবাব দিল না। ঘরের দরজায় অনজু আর বিলু উঁকি দিচ্ছিল। তাদের হাতে লুডু বোর্ড। রাহেলা বললেন, প্রিসিলার জ্বর। প্রিসিলা খেলবে না। তোমরা এখন ওকে বিরক্ত করবে না।

প্রিসিলা বলল, মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলতে চাই।

না। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

শুয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইচ্ছে না হলেও থাকবে। আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করছি।

রাহেলা নিচে নেমে গেলেন। নিচে গিয়ে দেখলেন, কবীর পাংশুমুখে বসে আছে একটা চেয়ারে। তার ঠোঁট কাটা, সেখানে রক্ত জমে আছে। আমিন সাহেব বসে আছেন তার সামনে। রাহেলা বললেন, কী হয়েছে?

মিছিলে গিয়েছিলাম চাচি। হঠাৎ পুলিশ তাড়া করল। দৌড়াতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেছি।

ঠোঁট তো দেখি অনেকখানি কেটেছে।

না, বেশি না।

আমিন সাহেব বললেন, খুব মিছিল হচ্ছে, না?

খুব হচ্ছে।

ওদের এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, ঠিক না?

আমিন সাহেব হেসে উঠলেন। রাহেলা গম্ভীর হয়ে বললেন, হাসির কোনো ব্যাপার হয়নি। তুমি হাসছ কেন?

হাসির ব্যাপার না, তবে আনন্দের ব্যাপার।

আনন্দের ব্যাপারটা কোথায়?

আমিন চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, একটা সিংহ তার ক্ষমতা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা আনন্দের নয়? রাহেলা জবাব দিলেন না। ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলেন। টেলিফোনে রিং হচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করা হলো। রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, পৃথিবীর কোনো দেশে এত খারাপ টেলিফোন সার্ভিস আছে বলে আমার জানা নেই।

.

খোকনের সমস্তটা দিন খুব খারাপ কেটেছে। ভয়াল-ছয়ের একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বল্টু ও টুন দুজনেই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। অবস্থা ভালো না হলে এরা ফিরে আসবে না। সাজ্জাদকেও তার বাসায় পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেছে কী তাও জানা

গেল না। সাজ্জাদের বোন কোনো কথারই জবাব দিতে পারেন না। শুধু কাঁদেন। অনেক ঝামেলা করে মুনিরকে পাওয়া গেল। মুনিরের কাছে স্যার এসেছেন, ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মুনির এক ফাঁকে বলে গেল, একটু দাড়া, স্যার এক্ষুনি চলে যাবেন। খোকন অপেক্ষা করতে লাগল। স্যার যেতে অনেক দেরি করলেন। বসে থাকতে থাকতে খোকনের প্রায় যখন ঘুম ধরে গেল তখন স্যার গেলেন। খোকন বলল, দুপুরে পড়িস তুই?

হুঁ। বাবা স্যার রেখে দিয়েছেন। স্কুল তো এখন বন্ধ, কাজেই ঘরে বসে যতটুকু পারা যায়। তোদের ভয়াল-ছয়ের কী অবস্থা?

ভালেই।

ভালো আর কোথায়! সব তো চলেই গেছে। তুই আর সাজ্জাদ এই দুজন ছাড়া তো এখন আর কেউ নেই।

আ আবার আসবে, তখন হবে।

এসব জিনিস একবার ভেঙে গেলে আর হয় না।

তোকে বলেছে।

খোকনের বসে থাকতে আলো লাগছিল না। সে একসময় বলল, ঘুরতে যাবি।

কোথায়?

ওই রাস্তায়, আর কোথায়?

না ভাই। বাবা রাগ করবেন। তাছাড়া বিকেলে আমার কাছে আরেকজন স্যার আসবেন। অঙ্ক স্যার।

কটা স্যার তোর?

বেশি না এই দুজনই। বৃত্তি পরীক্ষা আসছে তো, তাই।

খোকন একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। ফার্মগেট থেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল শাহবাগ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। শাহবাগের মোড়ে কিসের যেন জটলা। লোকজন বলাবলি করছে জী মিছিল আসছে পুরনো ঢাকা থেকে, একটা কাণ্ড হবে। একজন স্যুট টাই পরা ভদ্রলোক বললেন, খোকা তুমি বাড়ি যাও। খোকন বাড়ি গেল না। পাক মটরস পর্যন্ত গিয়ে চলে গেল কলাবাগানের দিকে। সেখানেও প্রচুর গণ্ডগোল, একটা পুলিশের ট্রাক পড়ছে। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। খোকনের দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ভিড় গলে ভেতরে ঢুকতে পারল না। একটা দমকলের গাড়ি এসে থেমে আছে। কেউ সেটাকে যেতে দিচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আশপাশে কোথাও পুলিশ বা মিলিটারির কোনো চিহ্ন নেই। খোকন কলাবাগানে কাটাল বিকেল পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে তাই সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল। বড়চাচা আজ নির্ঘাৎ ধরবেন। আজ বাড়িতে ভূমিকম্প হবে।

বড়চাচা অবশ্যি তাকে ধরলেন না। ধরলেন কবীর ভাইকে। রাতের খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই বিচারসভা বসল। আসামি মাত্র একজন। কবীর ভাই। বিচার বসল বড়চাচার লাইব্রেরিঘরে। সবাই সেখানে উপস্থিত। কবীর ভাই মাথা নিচু করে সোফার

একটা কোনায় বসে আছেন। বড়চাচা থেমে থেমে বললেন, তুমি একবার সকালবেলা একটা মিছিলের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঠোঁট কেটে এলে। তারপরও বিকেলবেলা আবার গেলে! অথচ আমি অনেকবার বলেছি এসব মিটিং-মিছিল থেকে দূরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তোমার কী বলার আছে?

কবীর ভাই চুপ করে রইলেন।

তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। তোমার কি ধারণা যা করছ দেশের জন্যে করছ?

জি।

ভুল ধারণা। হাঙ্গামা হুজ্জত করে দেশের কিছু হবে না। এতে দেশের অমঙ্গলই হবে, মঙ্গল হবে না। বুঝতে পারছ?

কবীর ভাই কিছু বললেন না। খোকনের আব্বা হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। শান্তস্বরে বললেন, আপনার কথাটা ঠিক না। আন্দোলন করে অনেক কিছু আদায় করা যায়। ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করে দেখুন। সেদিন আমরা আন্দোলন না করলে আজ রাস্তাঘাটে উর্দুতে কথা বলতাম।

আন্দোলনের অনেক রকম পথ আছে। গান্ধিজী অহিংস পথে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

আমিন চাচা বললেন, তার জন্যে গান্ধিজীর মতো নেতা দরকার। সেরকম যখন নেই তখন আমাদের পথে নামা ছাড়া উপায় কী?

এইসব বাচ্চা ছেলেপুলে পথে নামবে?

নামবে না কেন? নামবে। অল্পবয়স থেকেই তাদের শিখতে হবে।

বড়চাচা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, ভুট্টো সাহেব এসেছেন। আলোচনায় বসেছেন। এখন সব মিটমাট হবে। মিছিল ফিছিলের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এতে ওদেরকে শুধু খেপিয়েই তোলা হবে। কবীর আমার হুকুম অমান্য করেছে। কাজেই এর শাস্তিস্বরূপ সে আগামী এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। কবীর, আমি কী বলেছি তুমি বুঝতে পারছ?

পারছি।

আর শোনো, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আবার বের হয়ে যাও তাহলে এ বাড়িতে এসে আর ঢুকতে পারবে না।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হলো–শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তা এগোচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা একটা আপসে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন। শহরের পরিস্থিতি আগের মতোই। চারদিকে থমথমে ভাব যা ঝড়ের ইঙ্গিত দেয়।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে খোকনের মা খোকনকে ডেকে পাঠালেন। কাদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই আজও গিয়েছিলি? খোকন চুপ করে রইল। তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। খোকন বলল, কাঁদছ কেন?

কাঁদব না! তুই যেখানে সেখানে যাবি। আমি খোঁজও নিতে পারি না তুই কোথায় যাস কী করিস। আর কোথাও যাবি না।

আচ্ছা।

আমার গা ছুঁয়ে বল কোথাও যাবি না।

খোকন মাথা নিচু করে বসে রইল।

আয় না বাবা, আয়।

খোকন এগিয়ে যেতেই মা তার হাত ধরে ফেললেন। খোকনের কেন জানি খুব লজ্জা করতে লাগল।

১২. সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে

সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে না।

তার বোনটি সারাক্ষণ কাঁদে। কাঁদে নিঃশব্দে। সাজ্জাদ কিছুই করতে পারে না। শুধু বসে থাকে চুপচাপ। বড়ই একা একা লাগে তার।

মামাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো খবর এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন তারা কী করবে তা বুঝতে পারছে না। দেশের বাড়িতে চলে যাবে? কিন্তু কেউ নেই সেখানে। ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল। নদীর ভাঙনে কোথায় চলে গেছে। কে এখন আর জায়গা দেবে? তাছাড়া সাজ্জাদের বোন কোথাও যেতে চায় না। যদি কখনো মানুষটি ফিরে আসে? রাতেরবেলা খুব কম করে হলেও সে দশবার জেগে উঠবে। সাজ্জাদকে ডেকে বলবে–মনে হলো কেউ যেন এসেছে, আয় দরজাটা খুলি।

কেউ না আপা।

খোল না তুই। এরকম করছিস কেন?

দরজা খোলা হয়। কোথাও কিছু নেই। একটা কুকুর দরজার পাশে বসে হাই তুলছে শুধু।

সাজ্জাদের বয়স দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। আমাদের বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সেই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত সাজ্জাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। একদিন সে তার বোনের। দুল

নিয়ে বিক্রি করে এল সোনার দোকানে। দোকানি খুব সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছিল তার। দিকে। সরুগলায় বলেছিল, কার গয়না থোকাবাবু?

আমার বড়বোনের।

তাকে বলে এনেছ?

হ্যাঁ। সে নিজেই দিয়েছে।

দেখো খোকাবাবু, তুমি তোমার বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসো।

কেন?

আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা তুমি না বলে এনেছ। তুমি যাও, বোনকে নিয়ে আসো। আর শোনো, অন্য দোকানে যাবে না। তুমি ছোট মানুষ, ঝামেলা-টামেলা হবে।

সাজ্জাদ বোনকে নিয়ে এসেছিল। তারপরও দুদিন আসতে হলো। একবার একটি চুড়ি নিয়ে। আরেকবার আংটি নিয়ে। দোকানদার এরপর আর কিছু বলত না। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিত। শেষবার খুব শান্তগলায় বলল, এভাবে আর কত দিন চলবে? এবার তো অন্য কিছু চেষ্টা করা দরকার।

কী চেষ্টা করব?

একটা কাজ-টাজ করার চেষ্টা কেমন মনে হয়?

কী কাজ?

তাও ঠিক। তোমার যে বয়স তাতে কী কাজ আর করবে? তবে খোকাবাবু দিন আর এরকম থাকবে না। তুমি ভেঙে পড়বে না। দেশের অবস্থা বদলাবে। মানুষের ভাগ্যও বদলাবে। তুমি কি কিছু খাবে?

জি-না।

খাও। একটা কিছু খাও। এই যা তো একটি মিষ্টি আন। বুঝলে খোকাবাবু, এখন তোমার যে দুঃসময় সে দুঃসময় আমাদের সবার। তবে এটা থাকবে না।

এই লোকটির সঙ্গে সাজ্জাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তার দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাজ্জাদ উঁকি দিত আর সে হাসিমুখে বলত, আরে খোকাবাবু যে, এসো এসো। দেশের কী খবর বলো তো? ওরে, একটা মিষ্টি দিতে বল তো। অনেক রকম গল্পগুজব হতো তার সঙ্গে। মজার মজার সব গল্প।

বুঝলে খোকাবাবু, গয়নার দোকানের মালিকরা মানুষের দুঃখের গল্পগুলি খুব ভালো জানে। আমরা চোখের সামনে কতজনকে নিঃস্ব হতে দেখি। বড় খারাপ লাগে খোকাবাবু।

সাজ্জাদ বুঝতে পারে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। প্রায়ই তার বোন ভয় পাওয়া গলায় বলে, এখন কী হবে? সাজ্জাদ জবাব দিতে পারে না।

আর কয়েকদিন পর তো ঘরে রান্না হবে না। তখন কী করবি?

আমি কাজ করব।

তোকে কে কাজ দেবে? এবার তোর দুলাভাইয়ের অফিসে বরং যা। দেখ ওরা কী বলে।

ওরা কী বলবে?

জানি না কী বলবে। গিয়ে দেখ না।

একদিন সাজ্জাদ গেল সেখানে। এবং আশ্চর্য, লোকগুলি খুবই যত্ন করল তাকে। বারিন বাবু বলে এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি চিন্তা করবে না। এই কারখানাতেই তোমার একটা ব্যবস্থা করব। পড়াশোনা যা করছিলে তা-ই করবে, অবসর সময়ে কাজ শিখবে। ফেরার সময় বারিন বাবু বললেন, তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে একবার পঞ্চাশ টাকা ধার করেছিলাম, সেটা ফেরত দেওয়া হয়নি। তোমার কাছে দিয়ে দেই, কেমন? তখন দেখা গেল আরও অনেকেই একই কথা বলছে। কেউ দশ টাকা ধার নিয়েছিল। কেউ কুড়ি টাকা।

সাজ্জাদের মনে হলো লোকগুলি মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা এমন মধুর হয় কী করে কে জানে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বারিন বাবু তাকে কোলে করে একটি রিকশায় এনে তুলে দিলেন। ভরাট গলায় বললেন, তোমরা কোথায় থাকো জানতাম না। জানলে আরও আগে এসে খোঁজ নিতাম। এখন থেকে খোঁজখব না। তোমার কোনো ভয় নাই।

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরে দেখে দাদুমণি ও নীলু বসে আছে তাদের বাসায়। নীলুর মুখ দারুণ হাসিহাসি। এবং আশ্চর্য, বহুদিন পর দেখা গেল তার বোন কাঁদছে না। দাদুমণি বললেন, এই যে সাজ্জাদ বাবু, তুমি কোথায় ছিলে। তোমার জন্যেই বসে আছি। কাপড়চোপড় রেডি করো, সময় নাই।

সাজ্জাদ অবাক হয়ে তাকাল।

তোমরা দুজন এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোমার বোনকে রাজি করিয়েছি।

সাজ্জাদ কিছু বুঝতে পারল না।

তোমার কোনো সুবিধার জন্য বলছি না। আমার এবং নীলুর সুবিধার জন্যে। নীলু একা একা থাকে। তোমরা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরাঘুরি করতে পারি। তাই না গো দাদুমণি? নীল যসিমুখে বলল, যা। দাদুমণি বললেন, ঢাকায় আমরা কতাদন থাকতে পারি তা অবশ্যি জানি না। যদি শেখ মুজিব আর ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তায় কোনো ফল না হয় তাহলে ঢাকা ছাড়তে হবে। আমরা সবাই মিলে তখন গ্রামে চলে যাব। নীলগতে আমার একটা বড় বাড়ি আছে। নীলু হাসিমুখে বলল, খুবই সুন্দর বা বাড়ির পাশে একটা ছোট নদী আছে। নদীর নাম সোহাগী।

সাজ্জাদের বোন ইতস্তত করে বলল, ওর দুলাভাই যখন ফিরে এসে দেখবে কেউ নাই তখন?

আমরা এ পাড়ার সবাইকে বলে যাব। তাছাড়া সে আমাদের খুঁজে বের করবে। আমরা তো তাকে কম খোজাখুঁজি করিনি, কী বলো?

১৩. পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকে

পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকেই সবার ধারণা হলো কিছু একটা হয়েছে। হয়তে ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছে এ দেশের মানুষদের কোনো কথা শোনা হবে না। চারদিক থমথম করতে লাগল। খোকনের বড়চাচা দুপুর একটায় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ঘরে কিরলেন। ফিরেই বললেন, আজ যেন কেউ ঘর থেকে না বের না হয়। সবাই যেন ঘরে থাকে। কবীর কোথায়, কবীরকে ডাকো।

কবীরকে কোথাও পাওয়া গেল না। বড়চাচা থমথমে গলায় বললেন, ও কোথায় গিয়েছে?

কেউ জবাব দিতে পারল না।

খোকনকে ডাকো।

খোকন নিচে এমে এল। বড়চাচা বললেন, কবীর কোথায় জানো?

জি-না।

তুমি আজ ঘর থেকে বেরুবে না।

কেন চাচা?

শহরের অবস্থা ভালো না। শহরে মিলিটারি নামবে এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে।

খোকন কিছু বুঝতে পারল না। মিলিটারি তো নেমেই আছে। নতুন করে নামবে কী! বড়চাচা বললেন, তোমার ওই বন্ধুটি, সাজ্জাদ যার নাম, ও কোথায় আছে?

ও আছে দাদুমণির বাসায়।

কার বাসায়।

একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বাসায়। ওনাকে আমরা দাদুমণি ডাকি।

করেন কী উনি।

আমি জানি না চাচা।

তাঁর বাসায় আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। আমি ওই ছেলেটির জন্যে কিছু করতে চাই।

জি আচ্ছ, আমি নিয়ে যাব।

এখন যাও দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান আসামাত্র বড়চাচা বললেন, কবীর যখন ফিরবে তাকে ঢুকতে দেবে না। বলবে এ বাড়িতে তার জায়গা নেই। সে যেন তার নিজের পথ দেখে নেয়। বুঝলে?

আমিন চাচা সন্ধ্যাবেলা মুখ কালো করে ঘরে ফিরলেন। চা খেতে খেতে বললেন, শেখ মুজিবুর রহমান যে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন সেটা বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপার কী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

খোকনরা যখন ফার্স্টব্যাচে খেতে বসেছে তখন দারোয়ান এসে খবর দিল কবীর ভাই এসেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বড়চাচা বললেন, তুমি এই খবরটি আমাকে দিতে এসেছ কেন? তোমাকে বলে দিয়েছি না ওকে ঢুকতে দেবে না। যাও, যা বলেছি।

তাই করো।

বড়চাচি বললেন, সে কোথায় থাকবে রাতে?

যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবে। এ বাড়িতে না।

তুমি এটা ঠিক করছ না।

আমি যা করছি ঠিকই করছি।

না, ঠিক করছ না।

ওপর থেকে খোকনের বাবা নেমে এলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তগলায় বললেন, ভাইয়া, ছেলেটাকে ঘরে আসতে দেন।

যে ছেলে আমার কথা শোনে না সে আমার বাড়িতে থাকবে না।

আমরা বড় মাঝে মাঝে ভুল কথা বলি। সেসব কথা সবসময় মানা যায় না।

আমি ভুল কথা বলি।

না, আপনি ভুল কথা কম বলেন। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে ভুল করছেন। সবাইকে মূল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। এটা ঠিক না।

বড়চাচা তাকিয়ে রইলেন। খোকনের বাবা শান্তস্বরে বললেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় একসময় এসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরই বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার ছেলেমেয়েরা পরাধীন হয়ে থাক। চান? বলুন, আপনি চান?

না, চাই না।

তাহলে এমন করছেন কেন?

বড়চাচা ক্লান্তস্বরে বললেন, ওকে ভেতরে আসতে বলে। যাও, বলো ভেতরে আসতে।

দারোয়ান ছুটে গেল। কিন্তু গেটের বাইরে কাউকে পাওয়া গেল না। আমিন চাচা তক্ষুনি খুঁজেতে বের হলেন। বড়চাচি কাঁদতে শুরু করলেন।

খোকন অনেক রাতপর্যন্ত জেগে রইল। যদি কবীর ভাই ফিরে আসেন। আমিন চাচা ফিরলেন দশটায়। কবীর ভাইকে কোথাও পাননি। তার মুখের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ চিন্তিত।

.

গভীর রাতে খোকনকে ডেকে তোলা হলো। বাবা এসে খুব নরম গলায় বললেন, খোকন, তোমার মার শরীর খুব খারাপ, এসো, মায়ের পাশে বসো।

মায়ের ঘরে সবাই আছেন। বড়চাচা মাথা নিচু করে বসে আছেন একটি ছোট চেয়ারে। বড়চাচী মার হাত ধরে কাঁদছেন। মায়ের মুখ নীল বর্ণ। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। বারবার কেঁপে উঠছেন। নার্সটি বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। কিন্তু সবাই এমন ভাব করছে যেন তার কথা কে ওনেতে পাচ্ছে না। খোকন অবাক হয়ে তাকাল বাবার মুখের দিকে। কেন, হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না কেন? বাবা শান্তস্বরে বললেন, পাকিস্তানি মিলিটারিরা আক্রমণ করেছে খোকন। রাস্তায় মিলিটারি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ রাতে কাউকে যাবে না। আজ রাতে কিছুই করার নেই।

খোকন নিজেও শুনতে পেল প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে। ট্যাংক নেমে গেছে। বড়চাচা মদুস্বরে কী যেন বললেন। কেউ শুনতে পেল না। নার্স আবার বলল, ডাক্তার দরকার। সবাই চুপ করে রইল।

বাবা বললেন, খোকন, মায়ের পাশে গিয়ে দাড়াও।

হলো একটি অন্ধকার দীর্ঘ রাত। মানুষের সঙ্গে পশুদের একটা বড় পার্থক্য আছে। তারা কখনো মানুষদের মতো হৃদয়হীন হতে পারে না। পঁচিশে মার্চের রাতে হৃদয়হীন একদল পাকিস্তানি মিলিটারি এ শহর দখল করে নিল।

তারা উড়িয়ে দিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের প্রতিটি ছাত্রকে গুলি করে মারল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে হত্যা করল শিক্ষকদের। বস্তিতে ঘুমিয়ে থাকা অসহায় মানুষদের গুলি করে মেরে ফেলল বিনা দ্বিধায়। বাঙালিদের বেঁচে থাকা না-থাকা কোনো ব্যাপার নয়। এরা কুকুরের মতো প্রাণী, এদের মৃত্যুতে কিছুই যায় আসে না। এদের সংখ্যায় যত কমিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। এদের মেরে ফেলো। এদের শেষ করে দাও।

এক রাতে এ শহর মৃতের শহর হয়ে গেল। অসংখ্য বাবা তাদের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে গেল না। অসংখ্য শিশু জানল না বড় হয়ে ওঠা কাকে বলে। বেঁচে থাকার মানে কী?

শহরের জনশূন্য পথে দৈত্যাকৃতি ট্রাক চলল। ধ্বংস ও মৃত্যু। স্বজনহারা মানুষদের কান্নার সঙ্গে ঠাঠা শব্দে গর্জাতে লাগল মেশিনগান। জেনারেল টিক্কা খান বাঙালির মরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। যেন এরা দ্বিতীয়বার আর পাকিস্তানিদের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা না পায়।

পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তানের জনদরদী ভুট্টো চলে গেল পাকিস্তানে। সে হাউল্লসিত। প্লেনে ওঠার আগে হাসিমুখে বলে গেল, যাক শেষপর্যন্ত শত্রুদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেল।

ছাব্বিশে মার্চের সমস্ত দিন কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারল না। শহরে কার্ফু। ঘরে বসে শুধুই প্রতীক্ষা। এর মধ্যেই আবার অবাঙালিরা যোগ দিল মিলিটারিদের সঙ্গে। বলে দিতে লাগল–কাদের কাদের শেষ করে দিতে হবে। চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু।

ছাব্বিশ তারিখ ভোর এগারোটায় ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হলো।

... শেখ মুজিবকে বিনা বিচারে আমি ছেড়ে দেব না। আওয়ামী লীগ দেশের শত্রু। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আমার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে। এবারও তাদের পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে...

দেশের লোক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব? কী হচ্ছে ঢাকা শহরে? কিছুই জানার উপায় নেই। ঢাকা বেতার থেকে অনবরত হামদ ও নাতে রসূল প্রচারিত হচ্ছে।

পাশের দেশ ভারত। সেখানকার বেতারেও কোনো খবর নেই। এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, তারা কি কিছুই জানে না। কলকাতা বেতার থেকে দুপুরবেলা হঠাৎ করে গীতালি অনুষ্ঠান বন্ধ করে বলা হলো–

পূর্ববাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্বপাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ববাংলা রেজিমেন্ট, পূর্বপাকিস্তান পুলিশ, পূর্বপাকিস্তান আনসারস, পূর্বপাকিস্তান মুজাহিদ দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র বাজানো হলো সেই বিখ্যাত গান–আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। এই দেশে শুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনযাত্রা।

ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মৃতদেহ পড়ে রইল। সরাবার লোক নেই।

১৪. নীলু খুব মন খারাপ করে

নীলু খুব মন খারাপ করে একা একা বসে ছিল। রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আছে। তবু রান্নাঘরের বাতিটি ছাড়া আর সব বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। দাদুমণি নীলুর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, একা একা বসে আছ কেন? এসো, আমার সঙ্গে এসে বসো।

না।

ভয়ের কিছু নেই নীলু।

আমার ভয় করছে না।

সাজ্জাদরা কোথায়?

জানি না। রান্নাঘরে বোধহয়।

আমি কি বসব তোমার সঙ্গে।

জানি না, ইচ্ছা হলে বসেন।

দাদুমণি বসলেন। নিচুস্বরে বললেন, আমরা গ্রামে চলে যাব। সুযোগ পেলেই চলে যাব। নীলু কিছু বলল না। দাদুমণি বললেন, কার্ফু ওদের একসময় তুলতেই হবে। হবে না?

তুলতেই হবে কেন? না তুললে কে কী করবে?

দাদুমণি এর উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তার হাতে একটি ট্রানজিস্টার। তিনি বিদেশের রেডিও স্টেশনগুলি ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। এই ট্রানজিস্টারটি বেশি ভালো না। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এখনো হামদ ও নাতে রসূল হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ইংরেজি বাংলা ও উর্দুতে বলা হচ্ছে–শহরে কারফিউ বলবত আছে।

সাজ্জাদ ও সাজ্জাদের বোন চুপচাপ রান্নাঘরে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রান্নাবান্না হয়ে গেছে। শুধু ডাল-ভাত। কিন্তু কেউ খেতে বসছে না। কারও খিদে। নেই। একসময় সাজ্জাদের বোন কী বলল, সাজ্জাদ জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এটা এমন একটা সময় যখন কারও কথা বলতে ইচ্ছা করে না। দেখল দাদুমণি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নরমস্বরে বললেন, সাজা তোমরা রান্নাঘরে বসে আছ কেন? এসো সবাই একসঙ্গে বসি। নীলুকেও ডেকে এসো। ও খুবই মন খারাপ করছে।

নীলু এল না। তার নাকি কিছুই ভালো লাগছে না। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষপর্যন্ত দাদুমণি এলেন তাকে নিতে।

একা একা থাকলে আরও খারাপ লাগবে।

না, লাগবে না।

তাহলে বরং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

আমি এখন ঘুমুব না।

দাদুমণি চলে এলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নীলু দরজা বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ট্রাংক খুলে তার বাদামি রঙের খাতা বের করেছে। এখানে সে মাঝেমাঝে নিজের মনের কথা লেখে। সেই লেখাগুলি খুব গোপন। কেউ পড়তে পারে না। এমনকি দাদুমণিও না। তিনি জানেনও না যে তার এরকম একটা খাতা আছে। এটি সে জন্মদিনে পাওয়া টাকায় নিজে গিয়ে কিনে এনেছে। নীল খাতা সামনে রেখে পুরনো দুএকটা লেখা পড়ল, তারপর লিখতে শুরু করল–

২৬ মার্চ, রাত নটা

আমরা আজ সারা দিন ঘরে বন্দি হয়ে আছি। খুব খারাপ লাগছে আমার। বাইরের সব দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায় উঁকি দেওয়ার হুকুম নেই। এত খারাপ লাগছে। এই দেশটা লরা মেরীর দেশের মতো কেন হলো না। তাহলে কী চমৎকার হতো! ঘাসের বনে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়ে আমরা থাকতাম। শীতকালে তুষারঝড় হতো। জানালার পাশে বসে বসে দেখতাম সাদা বরফে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। দাদুমণি ঘরে একটা আগুন করে মজার মজার সব গল্প বলা শুরু করতেন। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। কোথাও যাবার উপায় নেই। এখনো অবশ্যি কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ! আমার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে

হচ্ছে। এইটুকু লেখা হওয়া মাত্রই খুব কাছেই কোথাও ঝাকে ঝাকে গুলির শব্দ হতে লাগল। ক্যাট ক্যাট করতে লাগল মেশিনগান। দাদুমণি নীলুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভীতস্বরে বললেন, দরজা খোল নীল।

নীলু দরজা খুলল না। দাদুমণি দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, মেঝেতে শুয়ে পড় নীলু, মেঝেতে শুয়ে পড়।

নীলু তাও করল না। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। গুলির শব্দ থেমে গেল। কিন্তু একজন পুরুষমানুষের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভয়াবহ চিৎকার। নীলু দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তার মুখ রক্তশূন্য। সে কাঁপা গলায় বলল, ওর কী হয়েছে দাদুমণি?

জানি তো না নীল।

কেউ কি দেখতে যাবে না ওর কী হয়েছে?

দাদুমণি সে-কথার জবাব দিতে পারলেন না। নীলু দ্বিতীয়বার বলল, কেউ কি যাবে না?

সাতাশ তারিখ চার ঘণ্টার জন্যে কার্ফু তোলা হলো। মানুষের ঢল নামল রাস্তায়। বেশিরভাগই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। করুণ অবস্থা। যানবাহন সেরকম নেই। সময়ও হাতে নেই। যে অল্প কয়েক ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে তার মধ্যেই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। পথে পথে মানুষের মিছিল। কিন্তু এই মিছিলের চরিত্র

বড় রাস্তার সব কটি মোড়ে সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছে। তাদের চোখেমুখে ক্লান্তি ও উল্লাস। তাদের ধারণা যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। তারা অলস ভঙ্গিতে নতুন ধরনের মিছিল দেখছে। এই মিছিলে আকাশফাটানো ধ্বনি নেই। এই মিছিলে কেউ পাশের মানুষটির সঙ্গেও কথা বলে না। শিশু কেঁদে উঠল মা বলেন, চুপ চুপ। শিশুরা কিছুই বোঝে না, তারা কাঁদে এবং হাসে। নিজের মনে কথা বলে। বয়স্ক মানুষেরা বলে, চুপ

যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়। তাদের কী হয়েছে। প্রিয়জন পাশে নেই? যার রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সে কি ফিরেনি? প্রশ্ন করার সময় নয় এখন। যে চার ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে এর মধ্যেই শহর ছাড়তে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে। সবাই দ্রুত যেতে চেষ্টা করে। শিশুরা হাসে ও কাঁদে, কোনো কিছুই তাদের বিচলিত করে না।

মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জনস্রোত দেখে। তাদের চকচকে বন্দুকের নল রোদের আলোয় ঝকমক করে। তারা মাঝেমাঝে কথা বলে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনো আশা ও আনন্দের গল্প। মজার কোনো স্মৃতি নিয়ে তামাশা। ওদের উচ্চস্বরের হাসির শব্দে শুধু শিশুরাই অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ তাকায় না।

কার্ফু শুরু হয় চারটায়। রাস্তাঘাট আবার জনশূন্য হয়ে যায়। শহরের অবস্থা যারা দেখতে বেরিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়। দাদুমণি ঘণ্টাখানেকের জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরেই শান্তস্বরে বললেন, শহর ছাড়তে হবে। কালই আমরা শহর ছাড়ব। তারপর আর কোনো কথা বলেন না। বিকাল চারটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তার ঘরে একা একা বসে থাকেন।

১৫. খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ

খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ হয়ে গেছে।

অনজু আর বিলু এখন আর চেঁচিয়ে এক্কাদোক্কা খেলে না। বড়চাচা সারা দিন তার নিজের ঘরেই বসে থাকেন। কারও সঙ্গে বিশেষ কথাটথা বলেন না। খোকনও বেশিরভাগ সময় থাকে তার নিজের ঘরে। সময় শুথ হয়ে গিয়েছে। মা মারা গেছেন মাত্র তিন দিন আগে অথচ খোকনের কাছে মনে হয় বহু বৎসর কেটে গেছে। আজ সকালবেলা হঠাৎ কী মনে করে খোকন তার মায়ের ঘরে গেল। সবকিছু আগের মতো আছে। মার লাল রঙের চটি দুটি পর্যন্ত যত্ন করে তুলে রাখা।

খোকন।

খোকন দেখল, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে, দরজার পাশে।

কী করছ খোকন?

কিছু করছি না।

এসো আমার ঘরে এসো। আমরা গল্প করি।

খোকন তার বাবার সঙ্গে চলে গেল। বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে তার যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে।

খোকন, মার জন্যে খারাপ লাগছে?

হুঁ।

লাগাই উচিত।

বাবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যক্তিগত দুঃবই সবচেয়ে বড় দুঃখ। আমাদের কথাই ধরো, আমরা নিজেদের দুঃখে কাতর হয়ে আছি, ঠিক না?

হ্যাঁ।

কিন্তু দেশের কী অবস্থা হচ্ছে বুঝতে পারছ তো? খুব খারাপ অবস্থা। এবং যতই দিন যাবে ততই খারাপ হবে।

খোকন কিছু বলল না। নিচ থেকে এই সময় বড়চাচির কান্না শোনা গেল। বাবা চুপ করে গেলেন। কবীর ভাই এখনো ফিরে আসেননি। বড়চাচি দিনরাত সর্বক্ষণ তার জন্যে কাঁদেন। দিনেরবেলায় কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু রাতেরবেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবা বললেন, একমাত্র মহাপুরুষদের কাছেই ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়েও দেশের দুঃখ বড় হয়ে ওঠে। আমরা মহাপুরুষ না। আমাদের কাছে আমাদের কষ্টটাই বড় কষ্ট।

বড়চাচির কান্নার শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাবা চুপ করে বসে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললেন, তোমার কি মনে হয় বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন?

আমি জানি না।

সে তো কেউ জানে না। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

এভাবে কথা বললে তো হবে না খোকন। এখন থেকে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। খুব খারাপ সময় আমাদের সামনে।

খোকন চুপ করে রইল। বাবা শান্তস্বরে বললেন, এখন ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধ অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো চলবে। এর মধ্যেই তোমরা বড় হবে। কী খোকন, চুপ করে আছ কেন, কিছু বলো।

কী বলব?

ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

কে বলেছে?

বোঝা যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি। তোমার কী মনে হয়? হচ্ছে না?

হ্যাঁ।

খোকন, এই যুদ্ধে কে জিতবে?

উত্তর দেওয়ার আগেই ছোটচাচি এসে বললেন, খাবার দেওয়া হয়েছে?

রাহেলাকে দেখে মনে হচ্ছে তার জীবনের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গত দুরাতে এতটুকুও ঘুমুতে পারেননি। তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ ফ্যাকাসে। বাবা বললেন, আমরা একটু পরে আসি।

না, এখনই চলে আসেন। ঝামেলা সকাল সকাল চুকে যাক।

আসছি, আমরা আসছি।

খাবার টেবিলে বড়চাচা বললেন, আমাদের এখন কী করা উচিত, গ্রামে যাব।

আমিন চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, গ্রামে পালিয়ে গিয়ে কী হবে?

এখানে এরকম আতঙ্কের মধ্যে থাকা। সবার মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে।

গ্রামে পালিয়ে গেলেও সেই চাপ কমবে না। তা ছাড়া কবীর কোথায় আছে আমরা জানি না। ওকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

ছোটচাচার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাহেলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, আমি কোথাও যাব না। আমি আমেরিকা চলে যাব। আমি এই দেশে থাকব না।

আমিন চাচা কী একটা বলতে চাইলেন। বড়চাচা ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন। রাহেলা শিশুদের মতো কাঁদতে শুরু করলেন।

সব ঠিক হয়ে যাবে রাহেলা।

না, কিছুই ঠিক হবে না।

শান্ত হয়ে বসো।

আমি আর সহ্য কবুতে পারছি না।

হঠাৎ আমিন চাচা বললেন, সবাই চুপ। একটি কথাও না। সবাই তাকাল তার দিকে। তিনি চাপা গলায় বললেন, শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিসের শব্দ?

আমার মনে হয় একটা মিলিটারি গাড়ি এসে থেমেছে।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেল। দীর্ঘসময় কেউ কোনো কথা বলল না। গেটের কুকুরটি শুধু ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আমিন চাচা ভুল শুনেছিলেন, ওটা মিলিটারি গাড়ি ছিল না।

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে এসে পৌঁছল আটাশ তারিখ সন্ধ্যায়। খুব ঝামেলা করে আসা। প্রথমে শোনা গেল মীরপুর ব্রিজ কাউকে পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। মিলিটারি চেকপোস্ট বসেছে। যারাই শহর ছাড়তে চাচ্ছে তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না তাদের আলাদা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের ভাগ্যে কী ঘটছে কিছু বলা যাচ্ছে না। দাদুমণিরা মীরপুর ব্রিজের কাছে এসে পৌঁছলেন দুপুরে । তের চোদ্দজন মিলিটারির একটা

দলকে সেখানে সত্যি সত্যি দেখা গেল। এবং দেখা গেল দুটি ছেলেকে ওরা কী সব যেন জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীল বলল, ওদের কী জিজ্ঞেস করছে? দাদুমণি উত্তর দিলেন না। নীলু বলল, ওরা এরকম করছে কেন?

তুমি ওদিকে তাকিয়ো না। ওদের যা ইচ্ছা করুক।

সাজ্জাদের বোন বলল, ওরা আমাদের ধরবে?

না, আমাদের ধরবে না।

ওরা সত্যি সত্যি কিছু বলল না। তবে বাস থেকে প্রতিটি লোককে নামাল। এবং কোনো কারণ ছাড়াই বুড়োমতো একটা লোকের পেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুতো দিল। লোকটি উলটে পড়ে কো কো শব্দ করতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মিলিটারির সেই জোয়ান হাত নেড়ে সবাইকে বাসে উঠতে বলল। সবাই বাসে উঠল। বুড়ো লোকটি উঠতে পারল না। তার সম্ভবত খুব লেগেছে। সে মাটিতেই গড়াগড়ি খেতে লাগল। নীলু ফিসফিস করে বলল, ওকে মারল কেন দাদুমণি? ও কী করেছে?

জানি না। কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না।

তাহলে শুধু শুধু মারল কেন?

মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায়। এইজন্যেই এসব করছে। কিংবা হয়তো অন্যকিছু। আমি জানি না।

আরিচাঘাটে পৌঁছে খুব মুশকিল হলো। ফেরী নেই। নৌকায় করে কিছু লোক পারাপার করছে। কিন্তু নৌকার সংখ্যা খুবই কম। নৌকা জোগাড় হলো না। মাথার ওপর কড়া রোদ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। নীলু বলল তার শরীর খারাপ লাগছে।

দাদুমণি চিন্তিত মুখে বললেন, ঢাকায় ফিরে যাওয়াই বোধহয় ভালো। সাজ্জাদ কী বলো?

না, ঢাকায় যাব না।

নীল, তুমি কী বলো?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার দিকে একটা ট্রাক এল, সেটি আবার ঢাকা ফিরে যাবে। ট্রাকের ড্রাইভার বলল, আপনারা যাবেন ঢাকায়।

না গিয়েই বা উপায় কী? রাত কাটানোর একটা জায়গার দরকার। ট্রাকে উঠেই নীলুর প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল। সে দুবার বমি করে নেতিয়ে পড়ল।

আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হবে হয়তো। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাজ্জাদের বোন নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আরও চারজন মহিলা আছেন ওদের সাথে। ওরা সবাই বসেছে পাশাপাশি। তাদের সঙ্গে তিন-চার বছরের দুটি ফুটফুটে বাচ্চা। এরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রাকে বসে থাকা লোকগুলি কোনো কথা বলছে না। সবাই চিন্তিত। সবাই তাকিয়ে

আছে অন্ধকারের দিকে। একজন কে যেন বলল, বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে। কেউ তার জবাব দিল না।

কিছুদর পর ট্রাককে আবার ফিরে আসতে হলো আরিচা ঘাটে। ঢাকায় যাওয়া যাবে না। খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মিলিটারিরা নাকি মার্চ করে আসছে।

তারা সারা রাত বৃষ্টি মাথায় করে ট্রাকে অপেক্ষা করল। নদী পার হওয়ার নৌকা পাওয়া গেল না। কী কষ্ট, কী কষ্ট!

১৬. সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছল

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছল আটাশ তারিখ রাতে। এগারো মাইল হেঁটে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল নীলুর। সে কয়েকবার বমি করল। কোথায় ডাক্তার, কোথায় কী। নীলগঞ্জের লোকজন পালাচ্ছে, কারণ দেওয়ান বাজারে মিলিটারি এসে গেছে। তারা নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেওয়ান বাজার নীলগঞ্জ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। মিলিটারিরা এদিকেই হয়তো আসবে। নীলগঞ্জের লোকজন নৌকায় করে সুখানপুকুরের দিকে পালাচ্ছে। নীলু বলল, দাদুমণি আমি কোথাও যাব না। দাদুমণি বললেন, সুখানপুকুরে ডাক্তার পাওয়া যাবে।

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার ডাক্তার লাগবে না।

দাদুমণি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

সাজ্জাদ, কী করা যায়? যাবে সুখানপুকুরে?

চলেন যাই।

নৌকা জোগাড় করতে অনেক সময় লাগল। কেউ যেতে চায় না। গতরাতে নাক নদীতে গানবোট এসেছিল। আজও হয়তো আসবে। মাঝিরা বলল, হাটাপথে যান। হগগলেই হাঁটাপথে যাইতাছে।

অসুস্থ একটা মেয়ে সাথে আছে। হাঁটাপথে যাওয়া যাবে না। বড় নদীতে না গিয়ে যেতে পারবে না? বিশাখালি দিয়ে যাও।

কেউ রাজি হয় না। একজনকে শুধু পাওয়া গেল। তার নৌকাটা ছোট। দুপুররাতে তারা সবাই ভোলা নৌকায় করে রওনা হলো। অনেক লোকজন। একটা মাত্র নৌকা।

সে-রাতে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সুখানপুকুরের কাছাকছি আসতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ঠিক এই সময় রোগামতো একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, চুপ চুপ। শুনেন সবাই শুনেন। ছেলেটর হাতে একটি ট্রানজিষ্টার। সে ট্রানজিস্টার উঁচু করে ধরল বলল, স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান। স্বাধীন বাংলা বেতার।

ঘোষকের কথা পরিষ্কার না। ট্রানজিস্টারে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু সবাই শুনল–ওরা জানে না আমরা কী চীজ। জানে না ইবিআর কী জিনিস। আমরা ওদের টুপি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

ঘোষকের কথা শেষ হওয়া মাত্র রোগা ছেলেটি বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নাই। বলেন ভাই সবাই মিলে, জয় বাংলা। নৌকার প্রতিটি মানুষ আকাশফাটানো ধ্বনি দিল। ছেলেটি বলল, আবার বলেন।

জয় বাংলা।

বলেন, জয় বঙ্গবন্ধু।

জয় বঙ্গবন্ধু।

নীলু আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল। সে বিড়বিড় করে বলল, কী হয়েছে?

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বলল, নীলু, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলল।

কে যুদ্ধ করছে।

বাঙালি মিলিটারিরা।

শুধু ওরা।

না, আমরাও করব। আমিও যাব।

তোমাকে কি ওরা নেবে?

সাজ্জাদ দৃঢ়স্বরে বলল, নিতেই হবে।

যুদ্ধ শুরু হলো। রুখে দাঁড়াল বাঙালি সৈন্য, বাঙালি পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিল এ দেশের মানুষ। বৃদ্ধরা যেমন এগিয়ে এল তেমনি এগিয়ে এল নিতান্তই অল্পবয়েসী কিশোরেরা। তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসা। দেখতে দেখতে সেই সহায়সম্বলহীন বাহিনী একটি মহাশক্তিমান দুর্ধর্ষ সৈন্যদলে পরিণত হলো। এদের যুদ্ধ মুক্তির জন্যে। তাই এদের আমরা ভালোবেসে ডাকলাম মুক্তিবাহিনী। এদের স্বপ্ন একটিই : অন্ধকার রজনীর শেষে এরা আনবে একটি সূর্যের দিন।

একটি সূর্যের দিনের জন্যে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দান করতে হলো।

পরিশিষ্ট

খোকন মে মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্যে একটি চৌদ্দ বছরের বালককে বীর প্রতীক উপাধি দেওয়া হয়। মেথিকান্দা অপারেশনে এই বালকটি শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তার নাম সাজ্জাদ। একবার এই ছেলেটি ভয়াল-ছয় নামের একটি ছেলেমানুষী দল গঠন করেছিল। এবং ঠিক করেছিল ভয়াল-ছয়ের সদস্যরা পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহীন অরণ্য দেখতে যাবে। ছেলেমানুষদের কতরকম স্বপ্ন থাকে।